উন্মাদ

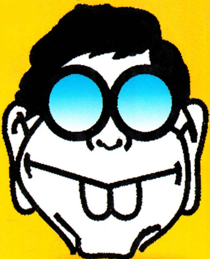

রমরমা রম্য

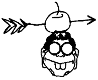

উন্মাদ

র ম র মা র ম্য

সম্পাদনা

আহসান হাবীব

জাগৃতি প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

সাজ্জাদ কবীর

আসরার মাসুদ

আমার প্রিয় দুই রম্য লেখক

ভূমিকা

উন্মাদের যখন স্বর্ণযুগ চলছিল... (তার মানে এই নয় যে উন্মাদের এখন তাম্র যুগ চলছে!) স্বর্ণযুগ বলতে আমি বুঝাচ্ছি উন্মাদ তখন বেশ জোরে সোরে বাজারে মোটামুটি নিয়মিত আসতে শুরু করছে সেই সময়কার কথা। পাঠকও বেশ সাদরে গ্রহণ করেছে আমাদের... তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কার্টুনের পাশাপাশি রম্য রচনাও প্রকাশ করা যাক। হুমায়ূন আহমেদ-এর এলেবেলে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। তারপর একে একে অনেক নবীন প্রবীণ রম্য লেখক আমাদের উন্মাদে লিখেছেন। এ গ্রন্থে আমরা চেষ্টা করেছি তাদের বেস্ট অব দ্যা বেস্ট লেখাগুলোই প্রকাশ করতে। অবশ্য এ গ্রন্থ প্রকাশের সকল কৃতিত্ব মাহবুবুল আলম মাসুদের। তার আগ্রহ ছাড়া হয়ত উন্মাদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রম্যগুলো হারিয়েই যেত!

আহসান হাবীব
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

সূ চি প ত্র

আবদার রশীদ ৯ কালযন্ত্র-না
হুমায়ূন আহমেদ ১৪ এলেবেলে
মুহম্মদ জাফর ইকবাল ১৮ টেলিফোন
খন্দকার আলী আশরাফ ২৩ সাত দিন আর এক দিনের কেচ্ছা
সালেহ চৌধুরী ২৪ এবং বাবর বাদশাহ
খসরু চৌধুরী ৩২ নববর্ষের চাঁদের আলোয়
আনিসুল হক ৩৮ দূরপাল্লার বাস ভ্রমণ
বিপ্লব দাশ ৪৩ কাকস্য
শাহেদ ইকবাল ৪৬ এই ঔষধ আমি কীভাবে পাইলাম
সাজ্জাদ কবীর ৫০ সেভ আওয়ার সোল
আসরার মাসুদ ৫৫ নাম নিয়ে নাকাল
এনামুল করিম নির্ঝর ৫৯ ভ্রমণেচ্ছুঃ গমনং সাবধানং
ফাকিহা হক ৬৩ বেচারাম ডিম বেচে, কেনা...
আহসান কবির ৬৭ মাতাল
হোসেন তৌহিদ জুয়েল ৭২ হাবিজাবি
মোকাম্মেল হোসেন ৭৭ ময়না কহ তারে...
মাহবুবুল আলম মাসুদ ৮১ এখানেই ভেঙেছে পা আমার প্রিয়ার
ইবনে ফয়েজ ৮৭ গেস্ট!
হঠাৎ বৃষ্টি ৯০ মাসুদ কামাল হিন্দোল
আহসান হাবীব ৯৩ ফজল আলীর ১৪০০ সাল

কালযন্ত্র-না

আবদার রশীদ

দুপুরে খাইয়া আসিয়া উপুড় হইয়া বুকের নিচে বালিশ দিয়া সম্পাদকের ফরমায়েস অনুযায়ী একটা আজগুবি গল্প লিখিতেছিলাম। আজই লেখাটা দিতে হইবে।

বেশ খানিকটা লিখিবার পর দেখি কলমের কালি ফুরাইয়া গেল। ধুত্তোর! এমন বিশ্রী লাগে! এমনিই তো খাইয়া আসিয়া কি রকম একটা ঝিমুনি লাগে। এখন কি আর এই সমস্ত বিরক্তিকর কাজ ভালো লাগে একবার ভাবিলাম, থাকগে, এখন আর লিখব না! একটু দিবানিদ্রা দিই বরঞ্চ।

বালিশের তলায় রিস্ট-ওয়াচ রাখিয়াছিলাম। দিবানিদ্রা দিবার সময় আছে কি না দেখিতে গেলাম। দেখিয়া কিন্তু অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ মনে হইল ঘড়িটার সেকেণ্ডের কাঁটাটা যেন টিকটিক করিয়া উল্টা দিকে চলিতেছে। আরে! ভালো করিয়া দেখিলাম আবার। না, ভুল দেখি নাই। উল্টা দিকেই চলিতেছে। কিন্তু এ কী করিয়া সম্ভব!

ভাবিতে-ভাবিতে কালিহীন কলমটা তুলিয়া লইয়াই লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এ কী রকম লেখা! লেখাটা যেইখানে শেষ হইয়াছিল, সেইখান হইতে এক অদ্ভুত কায়দায় উর্দু লেখার ভঙ্গীতে আমি কলম চালাইয়া চলিলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে কালিগুলি মুছিয়া কাগজটা ক্রমাগত সাদা হইয়া যাইতে লাগিল। এমনি করিয়া পাতার পর পাতা সাদা করিয়া

যাইতেছি। আরে! এত কষ্ট করিয়া গল্পটা প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম, সেটা কি এমনি করিয়া আবার সাদা হইয়া যাইবে নাকি?– অথচ আমি থামিতে পারিতেছি কই?

খানিকক্ষণ এইভাবে লিখিবার– অর্থাৎ লেখা মুছিবার পর ছাইদানী হইতে একটা সিগারেটের ভুক্তাবশেষ তুলিয়া লইলাম। ভিজা সিগারেটটা তুলিয়া লইবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা জ্বলিতে আরম্ভ করিল। মুখে দিয়া টানিতে লাগিলাম। প্রথমটা আঙ্গুলে গরম লাগিল, পরে দেখি আস্তে-আস্তে সিগারেটটা বেশ বড় হইয়া আসিতেছে। কায়দাটা মন্দ নয়– সিগারেটটাকে লইয়া ছাইদানীর উপর একটু নাড়িতেই খানিকটা করিয়া ছাই আসিয়া সিগারেটের আগায় ঝুলিতে থাকে। –লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সিগারেট টানিতেছি না– ফুঁকিতেছি। অর্থাৎ, মাঝে-মাঝে আমার সম্মুখে শূন্যে খানিকটা করিয়া ধোঁয়া আগাইয়া আসিতেছে এবং আমার নাক-মুখ দিয়া সবেগে এবং অনায়াসে ঢুকিয়া যাইতেছে, আর আমি সেই ধোঁয়াটাকে ফুঁ দিয়া সিগারেটের ভিতর পুরিয়া দিতেছি।

এতক্ষণে আমি কিন্তু ভয় পাইয়া গিয়াছি। বুঝিলাম সময়ের স্রোত উল্টা বহিতেছে। কিন্তু ইহাকে রোধ করি কেমন করিয়া। স্বপ্ন দেখিতেছি না তো? তাই বা কী করিয়া হইবে? স্বপ্নে কি চিন্তা করা যায়? অথচ, আমি তো বেশ চিন্তা করিতে পারিতেছি। আবার ঘড়িটা দেখিলাম। বারটা বাজে। অর্থাৎ ঘন্টা দুই পিছাইয়া গিয়াছে।

মনে পড়িল এইচ. জি. ওয়েলস-এর বৈজ্ঞানিক তাঁহার 'কালযন্ত্রে' চাপিয়া বিদ্যুৎ গতিতে ভবিষ্যতে গিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন। সে যন্ত্রকে ইচ্ছামতো চালাইতে ও থামাইতে পারা যাইত। কোনোরূপ যন্ত্রে আরোহন না করিয়াই আমিও যেন সেইরূপ অতীতের দিকে চলিয়াছি। তবে, আমার গতি বড় মন্থর এবং আমি নিজের ইচ্ছায় থামিতেও পারিতেছি না।

এই সমস্ত চিন্তা করিতে-করিতেই পিছাইয়া-পিছাইয়া গিয়া এক সময় খাওয়ার টেবিলে বসিলাম। গৃহিণী রান্নাঘরের কলের তলা হইতে একটি এঁটো বাসন আনিয়া দিল। আমি মুখের ভিতর হইতে মাখা ভাত বাহির করিয়া বাসনের উপর চটকাইতে লাগিলাম। বোন-প্লেট হইতে মাছের কাঁটা তুলিয়া লইলাম পাতে এবং মুখ হইতে মাছ বাহির করিয়া সেই কাঁটার সঙ্গে টিপিয়া-টিপিয়া লাগাইতে থাকিলাম। কখনও বা গ্লাস মুখের সামনে লইয়া গলগল করিয়া পানি বাহির করিলাম। –ছি, ছি, একি কাণ্ড! ভাবিয়া

দেখিলাম এমনি করিয়া সময় যদি পিছন দিকে চলিতে থাকে তাহা হইলে এক সময় আমার ফেলিয়া-আসা অতীত দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইব। কিন্তু এরকম যদি উল্টা কাজ হইতে থাকে সবই, তাহা হইলে তো শান্তি পাইব না একটুও! অসহ্য লাগিতেছে।

খাইয়া আসিয়া– অর্থাৎ উগরাইয়া গিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চিরুনী দিয়া চুলগুলি এলোমেলো করিয়া লইলাম। তারপর গোসলানায় ঢুকিয়া ভিজা গামছা দিয়া মাথা মুছিতে গেলাম– গামছাটা গেল শুকাইয়া আর আমার মাথা ভিজিয়া সপসপ করিতে লাগিল। শুধু তাই নহে। গোসলখানার নর্দমা দিয়া সমস্ত পানি আমার গা বাহিয়া-বাহিয়া উঠিয়া কলের নলের ভিতর দিয়া সশব্দে ও সবেগে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি, মা এবং আমার গৃহিণী অনেক কথাবার্তাই কহিয়াছি, কিন্তু সে যে কি ভাষা তা বহু মাথা ঘামাইয়াও বুঝিতে পারি নাই। – মুখের ভতর দিকে বাতাস টানিয়া গলার মধ্য হইতে বিচিত্র এক শব্দ বাহির করা কেবল। গোসলখানায় গিয়া আমি সেই ভাষাতেই গান আরম্ভ করি। গানের প্রথম লাইনটা বারংবার ঘুরিয়া আসে বলিয়া সেই লাইনটি আমার মনে আছে। সে ভাষাকে লেখায় রূপান্তরিত করা যদিও প্রায় অসম্ভব, তবু আমি সেই লাইনটি যতটা সম্ভব তুলিয়া দিয়াছি– "উর্ অব্‌ম্ অড্ অড্‌ন্ অচ্ অর্ প্-এর অব্‌ম অ অর্ আঁধু আঁ।"– ভিতর দিকে শ্বাস টানিয়া উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। মনে হইতেছে ভয়ানক কঠিন, না? অথচ অবলীলাক্রমে গাহিতেছি। মনে পড়িল, সময় যখন সোজা চলিতেছিল, তখন আমি গোসলখানায় গাহিয়াছিলাম "আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু।"

ইহার অনেকক্ষণ পরে (পরে, না আগে কী বলিব?) আর একবার ঘড়ি দেখিলাম। সাড়ে ন'টা বাজে। কী মনে হইল, পিছু হটিয়া-হটিয়া রান্নাঘর হইতে মাছ-তরকারী ভর্তি বাজারের থলি হাতে করিয়া সাইকেল লইয়া বাহির হইলাম। সাইকেলে পিছন ফিরিয়াই উঠিলাম এবং পিছন দিকেই চালাইতে লাগিলাম। রাস্তায় দেখি লোকজন গাড়িঘোড়া এমনকি আকাশের পাখিরাও সব পিছন দিকে চলিতেছে। মৌলবীবাজার গিয়া বিভিন্ন দোকান ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তাহাদের মাছ-তরকারী ফেরত দিয়া পয়সা লইলাম এবং সেই অদ্ভুত ভাষায় সম্ভবত জিনিসগুলির দরদাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। বাজারের খালি থলি লইয়া আবার যখন উল্টা সাইকেল চালাইয়া বাসার

দিকে আসিতেছিলাম তখন লারবাগের মোড়টার কাছে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিলাম। আস্তে সাইকেল হইতে নামিয়া সাইকেলটাকে মাটিতে শোয়াইয়া রাখিলাম এবং নিজেও গা-হাত-পা ঝাড়িতে-ঝাড়িতে উপুড় হইয়া পথের উপর শুইয়া পড়িলাম। পর মুহূর্তেই সেই শোয়া অবস্থা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কোনো অলৌকিক ক্ষিপ্রতার সহিত আসিয়া সাইকেলে চড়িয়া বসিলাম। সেই মুহূর্তে একটা বাস পিছন দিক পিছাইতে-পিছাইতে আসিয়া আমার সাইকেলটাকে ছুঁইয়া সাঁ করিয়া সামনের দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। দেখিলাম ড্রাইভারটা আমার দিকে তাকাইয়া হর্ন দিতে-দিতে পিছাইতেছে।

বাসায় যখন ফিরলাম তখন আটটা বাজে। খানিকক্ষণ পূর্বোক্ত কায়দায় সিগারেট টানিলাম– থুড়ি, ফুঁকিলাম। তারপর চা-ডিম-রুটি উগরাইয়া বাহির করিলাম। গোসলখানায় গিয়া দাঁত মাজিলাম এবং পেস্টটুকু দাঁত হইতে চাছিয়া আনিয়া টিউবে ভরিয়া রাখিলাম। তারপর হাই তুলিতে গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

একটু পরে (?) ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া শুনিলাম, কে যেন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র কণ্ঠে ডাকিতেছে, "ওছনউশ? ইএ।" পরক্ষণেই যেন মনে হইল পরিষ্কার শুনিতেছি– "এই শুনছ? ওঠ। কত ঘুমোবে?"

জাগিয়া উঠিলাম। উঠিয়া দেখি–এখনও তাজ্জব কাণ্ড। গাছপালার পিছন হইতে লাল সূর্যটা উঁকি মারিতেছে। ঘড়ি দেখিলাম ছ'টা বাজে। তাহা হইলে ব্যাপারটা কি কিছুতেই স্বপ্ন নয়? সত্যি-সত্যিই কি সময়টা পিছাইতে-পিছাইতে ভোর পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল?

ভয়ে বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলাম– "হ্যাঁ গো, ভোর হল নাকি?"

"হ্যাঁ, এই তো সূর্য উঠছে দেখছ না?" বলিতে-বলিতে হাসে।

আমার এমন রাগ হইল। বলিলাম– "কি ফিচ্‌ফিচ্ করে হাসছ? দুনিয়া কোন তালে চলছে খেয়াল রাখ কিছু?"

শুনিয়া গৃহিণী মুখে আঁচল চাপা দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ভাবিলাম দুনিয়া যে পিছন দিকে চলিয়া আসিয়াছে তাহা আর কাহারো নজরে পড়ে নাই। তাহা হইলে আমার এইরূপ হইল কেন? বুঝিলাম আমরা সকলেই খানিকটা 'অতীতের' ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছি ঠিকই কিন্তু বর্তমানের বুদ্ধিটুকুও শুধু আমার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে তাই আর সকলের কাছে যাহা নিতান্তই স্বাভাবিক, আমাকে তাহাই ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

পাশের ঘরে গৃহিণী বলিতেছে শুনিলাম– "শুনেছেন মা, আপনার

ছেলের কাণ্ড! হি-হি-হি এখন নাকি ভোর হচ্ছে, হি হি হি।"

মা আসিলেন। মনে হইল হাসি চাপিতে-চাপিতে। আমাকে হতভম্বের মতো পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন– "কি রে, উঠবি না? ঘুম থেকে ডেকে তুললে তো রাগারাগি করিস, অথচ দেখ তো কাণ্ড। সন্ধ্যা যে হয়ে এল।"

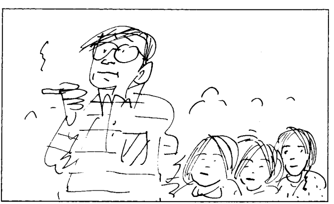

এলেবেলে
হুমায়ূন আহমেদ

সম্প্রতি একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। এলেবেলে লেখা সেটা দিয়েই শুরু করা যাক।

বৈশাখী মেলায় গিয়েছি চার কন্যাকে সঙ্গে করে। তিনটি আমার নিজের, অন্যটি ধার করা। গিয়ে দেখি কুম্ভমেলার ভীড়-ঢাকা শহরের অর্ধেক লোক এসে উপস্থিত। মাটির হাড়িকুরি যাই দেখছে তাই তারা কিনে ফেলছে। অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখতে কি যেন বিক্রি হচ্ছে খুব সস্তায়- এক টাকা পিস। সবাই কিনছে, আমিও কিনলাম। তারপর কিনলাম দুখানা রবিঠাকুর। এবারের মেলায় রবিঠাকুর খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে- চার টাকা জোড়া। আমার ছোট মেয়েটি রবিঠাকুরকে নিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার কিছু হল না মহাকবি দু' টুকরা হয়ে গেলেন। কান্না থামাবার জন্যে আরেকটি কিনতে হয়। কিন্তু একবার কোনো দোকান ছেড়ে এলে আবার সেখানে ঢুকা অসম্ভব। নতুন একটি ঘরে উঁকি দিলাম। বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, আপনাদের রবিঠাকুর আছে? দোকানি আমাকে বেকুব ঠাওড়াল কি না জানি না এক বুড়োর মূর্তি ধরিয়ে দিল। বুড়োটি খালি গায়ে বসে আছে হাতে হুঁকো। বাতাস পেলেই সমানে মাথা নড়ছে। সাদা চুল, সাদা দাড়ি- রবিঠাকুর যে এতে সন্দেহের কিছু নেই।

আমরা তালের পাখা কিনলাম, মাটির কলস কিনলাম, সোলার কুমির কিনলাম (কিছুক্ষণের মধ্যেই টিকটিকির মতো এর ল্যাজ খসে পড়ল)।

দড়ির শিকা, বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো (কলসি কাঁখে) বিশাল বক্ষা বঙ্গ ললনা কিনলাম। আমার কন্যারা দেখলাম দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি গাঢ় অনুরাগ নিয়ে জন্মেছে। যাই দেখছে তাই তাদের চিত্তকে উদ্বেলিত করছে, তাই তারা কিনবে। একসময় এদের পিপাসা পেয়ে গেল। চার জনের জনেন্য চারটি কাঠি-আইসক্রিম কেনা হল। যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা শুরুতে বলেছি সেটা শুরু হল তখন। মেজো মেয়ে তার আইসক্রিম আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, "এক কামড় খাও বাবা।" আমি খেলাম এক কামড়। একজন যা করে অন্য সবারও তাই করা চাই-কাজেই অন্য সবাইও আইসক্রিম বাড়িয়ে ধরতে লাগল আমার দিকে। কিছুক্ষণের মধেই আমাদের ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে উঠল। দৃশ্যটি অদ্ভুত! চারটি ছোট-ছোট মেয়ে আইসক্রিম হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং বয়স্ক লোক কপকপ করে সবার আইসক্রিমে কামড় বসিয়ে দিচ্ছে। যেন কোনো একটা কম্পিটিশন হচ্ছে। এর মধ্যেই লক্ষ্য করলাম অচেনা একটা ছেলে তার বাবাকে বলছে, "বাবা, আমিও ওই লোকটাকে আইসক্রিম খাওয়াব!" ভয়াবহ পরিস্থিতি!

এ রকম ভয়াবহ পরিস্থিতিকেই বোধহয় বেকায়দা অবস্থা বলা হয়। এটা এমন একটা অবস্থা যাকে কিছুতেই কায়দা করা যায় না। অথচ এমন অবস্থায় আমাদের প্রায় রোজই পড়তে হয়। একবার এক মফস্বল শহরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল প্রধান অতিথি করে (খুব সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ কাউকে তারা রাজি করাতে পারে নি)। অনেক বক্তৃতাটক্তৃতার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রথমেই একক নৃত্য- জলে কে চলেল কার ঝিয়ারি। চৌদ্দ-পনের বছরের এক বালিকা কলসি কাঁখে উপস্থিত হল। বিশাল কলসি পানিতে কানায়-কানায় ভরা। নাচের তালে-তালে ছলকে-ছলকে পানি পড়ছে। রিয়েলিস্টিক টাচ দেবার একটা মফস্বলী প্রচেষ্টা। আমি অবাক হয়ে ভাবছি জল-ভর্তি-কলস নিয়ে জল আনতে যাবার প্রয়োজনটি কি ঠিক! তখন কলসি নিয়ে সে আছাড় খেল। ছোটখাট একটা বান ডেকে গেল স্টেজে। প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত সভাপতি যেহেতু স্টেজেই উপবিষ্ট ছিলেন কাজেই তাদেরকে সেই জল স্পর্শ করল। দর্শক মহলে তুমুল আনন্দ ও উত্তেজনা- "ওয়ান মোর" "ওয়ান মোর" ধ্বনি। অনুষ্ঠান শেষে আমি ভিজা প্যান্ট নিয়ে বাসে উঠলাম। বাসের সমস্ত যাত্রী খুব সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল আমার দিকে। যার পাশে বসলাম সে

অনেকখানি সরে বসল।

এটা হচ্ছে বড় ধরনের বেকায়দার গল্প। ছোট ধরনের বেকায়দাও প্রচুর ঘটেছে। আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা ধরতে পারবেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান কি আপনারা কখনো মন দিয়ে লক্ষ করেছেন? ঠিক আছে দৃশটি কল্পনা করুন– গুরুগম্ভীর একজন সভাপতি পুরস্কার দিচ্ছেন। পুরস্কার নিচ্ছে এক তরুণী। সভাপতি ভাবলেন যেহেতু মেয়ে কাজেই সে নিশ্চয়ই হাণ্ডশেক করবে না। মেয়েটি হাণ্ডশেক করতে গিয়ে লজ্জিত হয়ে লক্ষ করল সভাপতি হাত বাড়াচ্ছেন না। সে লাল হয়ে হাত নামিয়ে নিল। ততক্ষণে সভাপতি হাত বাড়িয়েছেন। মেয়েটি হাত নামিয়ে ফেলেছে দেখে তিনিও ঈষৎ লাল হয়ে হাত নামালেন। ইতোমধ্যে মেয়েটি আবার হাত বাড়িয়েছে। সমগ্র দর্শকমণ্ডলী দারুণ টেনশনে ঘটনার পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করছে।

বেকায়দা পরিস্থিতির ব্যাখ্যার জনে আবার শিশুদের কাছে ফিরে যাই। আমার ধারণা [এবং বদ্ধমূল বিশ্বাস] শিশুরা বড়দের প্রতি আক্রোশবশত কিছু-কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর পেছনে শিশুসুলভ সারলফারল বলে কিছু নেই। জনৈকা ভদ্রমহিলা খুব দুঃখ করে একটা ঘটনা বললেন– তিনি এক বাসায় বেড়াতে গিয়েছেন। দেখলেন তিন বছর বয়েসী একটি ছেলে পটিতে বসে বাথরুম সারছে। ছেলেটি তাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে ভেবে তিনি বললেন, "বাহ খুব সুন্দর পটি তো তোমার! ভারি সুন্দর। আমি এত সুন্দর পটি জন্মেও দেখি নি।" ছেলেটি কোনো কথা বলল না। গম্ভর হয়ে রইল। নাশতাটাশতা দেওয়া হয়েছে এমন সময় ছেলেটি এসে ঘোষণা করল পটিটি সে সম্মানিত অতিথিকে দিয়ে দিয়েছে। এখন অতিথিকে সেখানে বসে বাথরুম করতে হবে। ছেলের মা বিব্রত হয়ে বলছেন, "ছিঃ লক্ষ্মীসোনা এসব কী বলে! তোমার খালা হয় না!"

কিন্তু ততক্ষণে ওর মাথায় ব্যাপারটা ঢুকে গেছে। কাজেই সে হাত-পা ছুঁড়ে বিকট চিৎকার শুরু করেছে। চায়ের কাপটাপ উল্টে ফেলছে। তাকে সামলাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে পটিতে বসার একটা ভঙ্গি করতে হল।

অনেকেই বলেন শিশুরা সত্যবাদী হয়। আমার মনে হয় না কথাটা ঠিক। তারা সত্যি কথা বল তখনি যখন কাউকে বিব্রত করার প্রয়োজন হয়। ঘটনাটা বলি। একজন সংস্কৃতিবান মহিলাকে আমি চিনতাম যিনি

আমার লেখালেখি নিয়ে নানান সময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।মাঝে-মধ্যেই যেতাম তাঁর বাসায়। সাহিত্যটাহিত্য নিয়ে উচ্চ মার্গের কথাবার্তা হত। সেদিনও তাঁর বাসায় গিয়েছি। বাংলাদেশে কেন তুর্গেনিভের মতো বড় উপন্যাসিকের জন্ম হল না এই নিয়ে কথা হচ্ছে এমন সময় তাঁর ছোট মেয়েটি হঠাৎ কথা বলল। বেনী দুলিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল– "চাচা আম্মু না আপনাকে ছাগল ডাকে।" অধিক শোকে পাথর বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা মিথ্যা নয়। ভদ্রমহিলা পাথর হয়ে গেলেন। তুর্গেনিভ প্রসঙ্গ আর জমল না।

এলেবেলে লেখা শেষ করার আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি নিয়ে একটি ফরাসি রসিকতা বলি। একজন ফরাসি তরুণী (অবশ্যই রূপবতী এবং...) সন্ধ্যাবেলা তার কুকুরটিকে নিয়ে পার্কে হাঁটতে গেছেন। সেখানে দেখা হল এক বুড়োর সঙ্গে। বুড়োটিও একটি কুকুর নিয়ে পার্কে এসেছে। না এই রসিকতাটি বলা যাবে না। রসিকতাটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে এবং আমার ধারণা উন্মাদের পাঠক-পাঠিকারা সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। হা হা হা।

টেলিফোন
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

মানুষের সভ্যতা যে উল্টো দিকে যাচ্ছে তার অনেকগুলি প্রমাণ আছে। আমার ধারণা তার প্রথম প্রমান হচ্ছে টেলিফোন। একসময় মানুষের জীবন ছিল নির্ঝঞ্ঝাট এবং নিরুপদ্রব। সারা দিন খাটাখাটনি করে তারা বাড়িতে নিজের আপনজনের কাছে ফিরে আসত এবং কেউ তাদের বিরক্ত করত না। এখন পৃথিবীর যে-কোনো মানুষ অন্য যে-কোনো মানুষকে যখন খুশি টানাহ্যাচড়া করতে পারে। আমার সামনে একটা টেলিফোন রয়েছে আমি ইচ্ছে করলেই সেটার কয়েকটা নাম্বার ঘুরিয়ে পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠ থেকে একজনকে ঘুম থেকে তুলে ফেলতে পারি। তার উপর যদি আমার রাগ থাকে তা হলে খানিকক্ষণ বকাবকিও করতে পারি। আমার এই অহেতুক উপদ্রবের বিরুদ্ধে তার কোনো রকম আত্মরক্ষার সুযোগ নেই। ব্যাপারটি যে কী রকম ভয়ঙ্কর কখনো চিন্তা করে দেখেছেন?

কোনো কোনো পাঠক সম্ভবত মুচকি হেসে ভাবছেন আমি সাধারণ একটা জিনিস নিয়ে বাড়াবাড়ি করছি কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। বহু দিন আগে যখন ইরান আমেরিকান অ্যাম্বেসির লোকজনকে আটকে ফেলল তখন আমেরিকার লোকজন ইরানের উপর মহাখাপ্পা হয়ে উঠল। আমেরিকার সাধারণ লোকজনের ভাবনা-চিন্তার পরিধি বেশি বড় না, তারা এই ধরনের একটা সমীকরণ সমাধান করল, "যেহেতু ইরানের লোকজন মুসলমান কাজেই মুসলমান লোকজন নিশ্চয় ইরান দেশীয়।" মুসলমান

লোক কারা সেটি বের করা সহজ– টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তাদের নাম মুহম্মদ দিয়ে শুরু হয়েছে। কাজেই আমার মতো অনেকেই (তাদের একমাত্র দোষ তাদের নামের আগে মুহম্মদ রয়েছে) খুব বিপদে পড়ে গেল। গভীর রাতে আমাদের কাছে টেলিফোন আসত এবং লোকজন যাচ্ছে-তাই ভাষায় আমাদের গালিগালাজ করত! অন্যদের কথা জানি না আমি যখন হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে টেলিফোন ধরি আমার মস্তিষ্ক তখন পুরোপুরি শর্ট সার্কিট হয়ে থাকে– জঘন্য গালিগালাজ শুনে প্রতিবাদ দূরে থাকুক ছোটখাট কথাও বলতে পারি না! এই পুরো ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছিল টেলিফোন নামক এই দূষিত যন্ত্রটির জন্যে!

ঠিকভাবে ব্যবহার করলে সম্ভবত টেলিফোনের এক-দুইটি ভালো দিক খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে কয়জন মানুষ ফোন ঠিক করে ব্যবহার করে? মাত্র কয়েক দিন আগে আমার একটা টেলিফোন এসেছে, আমি দৌড়ে এসে টেলিফোন ধরেছি। তখন অন্যপাশ থেকে মানুষটি বলল, "বলুন।"

আমি বললাম, "কী বলব?"

তিনি বললে, "এ্যাঁ।"

আমি বললাম, "কী বলব?"

তিনি বললেন, "আপনি কী বলবেন আমি কি জানি!"

আমি ধৈর্য হারা না-হয়ে গলা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, "আপনি যেহেতু ফোন করেছেন কাজেই আপনি বলবেন। আমি ফোন করলে আমি বলতাম।"

ভদ্রলোক কেমন যেন রেগে গেলেন, বললেন, "আপনি কে বলছেন?"

আমিও তখন রেগে গেলাম কিন্তু রাগটা গলায় প্রকাশ না-করে বললাম, "আপনি কাকে চাইছেন?"

"এ্যাঁ?"

"আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোক এবারে আমার নাম বললেন। আমি গলায় মধু ঢেলে বললাম, "জ্বী কথা বলছি!"

"আমি একটা খোঁজ নিতে চাইছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে–"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি কে বলছেন?"

"এ্যাঁ?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আমি কে সেটা ইম্পরট্যান্ট না। আমি একটা খোঁজ নেবার জন্যে ফোন করেছি।"

আমি গলায় মধু ঢেলে বলাম, "আপনি কে সেটা আমার জন্যে ইম্পরট্যান্ট। আপনি কে বলুন?"

"আপনি আমাকে চিনবেন না।"

"তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু টেলিফোন করলে সব সময় নিজের পরিচয় দিতে হয়। আপনি কে কথা বলছেন?"

"এ্যাঁ?"

আমি ধৈর্য ধরে টেলিফোন ধরে বসে রইলাম, "বলুন, আপনি কে কথা বলছেন!"

অন্য পাশের ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে পরিচয় দিলেন এবং আমাদের টেলিফোনের আলাপ আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল। টেলিফোন করলে যে প্রথমে নিজের পরিচয় দিতে হয় আমি সেটা জোর করে তার মাথায় ঢোকাবার চেষ্টা করছি কিন্তু খুব লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না।

আমাদের দেশে টেলিফোনে তবু এক ধরনের উত্তেজনা রয়েছে, টেলিফোন করলে মানুষের সাথে কথা হয় এবং সে কারণে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো জিনিস ঘটে যেতে পারে কিন্তু উন্নত বিশ্বের অবস্থা আরো শোচনীয়। আজকাল সেখানে কেউ সত্যিকার মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না, এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রের সাথে কথা বলতে হয়! টেলিফোন করলেই কোনো নারী কণ্ঠ বলবে, "তুমি যদি অমুক জিনিসটা জানতে চাও তা হলে অমুক সংখ্যাটি ডায়াল কর এবং অমুক জিনিসটা জানতে চাও তা হলে অমুক সংখ্যাটি ডায়াল কর এবং অমুক জিনিসটি জানতে চাও তা হলে অমুক সংখ্যাটি ডায়াল কর।"

সরল বিশ্বাসী কেউ যদি "অমুক" জিনিস জানার জন্যে "অমুক" সংখ্যাটি ডায়াল করে তা হলে নিশ্চিতভাবে কেউ একজন থমথমে গলায় বলবে, "খুব ভালো করে শোন, এই কথাটি কিন্তু মাত্র একবার বলা হবে। তুমি যদি অমুক তথ্যটির অমুক অংশটি জানতে চাও তা হলে অমুক সংখ্যাটি ডায়াল কর যদি অমুক অংশটি জানতে চাও তা হলে অমুক সংখ্যা–" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে ফোন করেছে সে সত্যি-সত্যি যদি অমুক তথ্যটির অমুক অংশ

শোনার জন্যে অন্য একটি সংখ্যা ডায়াল করে তা হলে আগের চাইতেও থমথমে গলায় কেউ কথা বলে তথ্যটির আরো সূক্ষ্ম ভগ্নাংশে নিয়ে যেতে থাকবে। এভাবে যেতে-যেতে যন্ত্রটি উত্তরটি "হ্যাঁ" বা "না" পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে– এবং প্রায় সময়েই দেখা যাবে যে ফোন করেছে তাকে দিয়েই প্রশ্নের উত্তরটি বের করে নিয়ে আসা হয়েছে! আমার কথা বিশ্বাস না-করলে শহরের কোনো একটি আই.এস.ডি. ফোন ব্যবহার করে চোখ বন্ধ করে আমেরিকার কোনো একটি নম্বরে ফোন করে দেখতে পারেন!

টেলিফোন আমাদের জীবনের একেবারে যাবতীয় ফাঁকফোকড়ে ঢুকে গেছে! ইদানিং সেলুলার ফোন নামক একটা ভয়ঙ্কর জিনিস এসে গেছে যেটার কাছ থেকে কোনো মুক্তি নেই। আমাদের পরিচিত কিছু মানুষের সেলুলার ফোন আছে এবং মাঝে-মাঝে আমি সেটা দিয়ে তাকে ধাওয়া করি, টেলিফোন করে প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, "কোথায় আছেন এই মুহূর্তে?"

তারপর উত্তরে বিচিত্র সব উত্তর পাওয়া যায়, "নিউ মার্কেটে বইয়ের দোকানে", "রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি", "নওয়াবপুর ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ে গেছি", "সিনেমা দেখছি।" সবচেয়ে যেটা চমকপ্রদ সেটা সংক্ষিপ্ত, "বাথরুমে!"

শুনতে পাই আস্তে-আস্তে সব মানুষের একটা সেলুলার ফোন থাকবে এবং সবার জন্যেই একটা নম্বর থাকবে। সেই নম্বরটি হবে তার একেবারে নিজস্ব এবং পৃথিবীর যেখানেই সে যাক-না-কেন অন্য যে-কোনো মানুষ টেলিফোন ডায়াল করে তাকে পেয়ে যাবে। ব্যাপারটি চিন্তা করেই আমার আতঙ্কে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়! নম্বরটি যেহেতু একেবারেই তার নিজস্ব তা হলে মানুষটি মারা গেলে কী সেই টেলিফোনটি সহই মানুষটিকে কবর দেওয়া হবে?

আমি যেখানে কাজ করি সেখানকার টেলিফোন লাইন বজ্রপাত হয়ে একবার পুরো নিয়ন্ত্রণটুকু নষ্ট হয়ে গেল, হঠাৎ করে টেলিফোনটি আর এক টেলিফোন থেকে অন্য টেলিফোনে না-হয়ে সব টেলিফোন থেকেই সব টেলিফোনে হয়ে গেল। যাদের টেলিফোনে গোপন কথা বলার অভ্যাস তারা খুব বিপদে পড়ে গেল। কিন্তু অন্য সবার ভারি সুবিধে– টেলিফোন তুললেই শোনা যায় সবার সাথে সবাই কথা বলছে তার মাঝে নিজের কথাও বলে দেওয়া যয়; কোথাও আর ডায়াল করতে হয় না, ফোন তুলেই

আমরা চেনা কণ্ঠের জন্যে অপেক্ষা করি এবং সেটা শোনামাত্রই চেঁচিয়ে বলি, "অমুক সাহেব, আমি অমুক বলছি। আপনার কথা শেষ করেন আমার জরুরি কথা আছে।" সেটা চমৎকার একটা ব্যাপার ছিল, কোনো কাজ না-থাকলে আমরা টেলিফোন তুলে লোকজনের কথা শুনতাম। মাঝে-মাঝেই শোনা যেত আমার সম্পর্কে কেউ বলছে– সব যে সম্মানজনক কথা তা নয়, নিজের দোষ ত্রুটি আবিষ্কার করে চরিত্র গঠনের জন্যে ক্রস কানেকশানের উপর কোনো জিনিস নেই!

টেলিফোনের বর্তমান যে সমস্যা সেটা হচ্ছে এটা দিয়ে শুধুমাত্র শব্দ পাঠানো হয় যার সাথে কথা বলছি তাকে দেখা যায় না। যখন শব্দের সাথে ছবিও যেতে শুরু করবে তখন কিছু-কিছু জিনিসের খানিকটা উন্নতি হবে। যেমন মনে করা যাক কিছুদিন আগের একটা ঘটনা, আমার অফিসে তুলকালাম ঘটনা ঘটেছে। চিৎকার ঝগড়া হৈচৈ রাগারাগি এবং টেবিল থাকার কারণে ধারে কাছে কেউ আসছে না। রাগে আমার চোখ দিয়ে আগুন এবং নাক দিয়ে ধূয়া বের হচ্ছে। আমি গলা সপ্তমে চড়িয়ে ভোকাল কর্ডের বারটা বাজিয়ে ফেলেছি ঠিক তখন টেলিফোন বাজল, আমি সিরিভারটা তুলে হুঙ্কার দিয়ে বললাম, "হ্যালো।"

অপর পাশ থেকে রিনরিনে গলায় একজন বলল, "বলুন দেখি আমি কে? হি হি হি হি।"

আমি নিশ্চিত যদি এটি ভিডিও ফোন হত তা হলে আমাকে দেখেই ঝট করে টেলিফোন রেখে দিত এবং আমাকে দাঁত কিড়মিড় করে মানুষটি কে সেটা আন্দাজ করতে হত না!

সারা পৃথিবীতে যেরকম টেলিফোনের উন্নতি হয়েছে আমাদের দেশেও তার ছোঁয়া লেগেছে– তার মাঝে একটা হচ্ছে কার্ডফোন। বিপদের সময় খোঁজাখুঁজি করলে আজকাল আশেপাশে একটা কার্ডফোন পাওয়া যায়। তবে কার্ডফোন নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি ভালো নয়। যে কারনেই হোক আমার কপালে যেসব কার্ডফোন পড়েছে তাদের ক্ষুধা হয় সর্বগ্রাসি। টেলিফোন ডায়াল করার সাথে-সাথেই তারা কপকপ করে ইউনিট খেতে থাকে এবং অন্য পাশের মানুষটি এসে ফোন ধরার আগেই আমি আবিষ্কার করি সদ্য কিনে আনা টেলিফোন কার্ডটির সমস্ত ইউনিট খেয়ে সেটি কার্ডটিকে একটা ছোবড়া তৈরি করে উগলে দিয়েছে। কোনো মানুষ ভুল করলে তার সাথে রাগারাগি করা যায়, যন্ত্র করলে তারও উপায় নেই। আমি

টেলিফোন পোস্টে কয়েকবার লাথি দিয়ে চেষ্টা করে দেখেছি রাগ তো উপশম হয় নি উল্টো পায়ের ব্যথায় খুড়িয়ে-খুড়িয়ে হাঁটতে হয়েছে কয়েক দিন!

টেলিফোন নামক এই ব্যাধির শীঘ্রই উপশম হবে সেরকম মনে হয় না। আমার মনে হয় আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে যখন সবাই আবিষ্কার করবে যে আসলে আমরা টেলিফোনকে ব্যবহার করছি না টেলিফোনই আমাদের ব্যবহার করছে তখন হঠাৎ করে সবার টনক নড়বে!

আমি সেদিনের অপেক্ষা করে আছি।

সাত দিন আর এক দিনের কেচ্ছা

খন্দকার আলী আশরাফ

সাত দিন চোরের এক দিন গেরস্থের (ভাবান্তরে সাধুর) –এই মর্মে একটি প্রবাদ আদিকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আছে। এটা খনা দেবীর রসনাজাত, না অন্য কোনো মহাজন এই প্রবাদ উদ্বোধন করেছিলেন আজ গবেষণা করেও তার হদিস মিলবে বলে মনে হয় না। তবে এই মহা বচনটিতে চৌর্যবৃত্তিতে আত্মনিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত দক্ষতা সুচারুরূপে বিধৃত করা হয়েছে। এবং একজন তস্কর যে গেরস্থের সাত গুন ওজনগুন সম্পন্ন ব্যক্তি, তার স্বীকৃতি রয়েছে চোর বনাম গৃহস্থের (বা সাধুর) খেলায়। শেষোক্ত ব্যক্তি যে অসহায় তা দুঃখের সঙ্গে হলেও সর্বজনকে জানানোর মহতী প্রয়াস রয়েছে এই প্রবচনে। গণিতের ভাষায় বলতে গেলে সেভেন ইস টু ওয়ান।

সাত দিন চোরের এক দিন সাধুর (মতান্তরে গেরস্থের) এই প্রবচনের বদলে বর্তমান লেখকের মতে আর একটি প্রবাদের জন্মদান করা অন্যায় হত না।

প্রমাণ চান? এই আমাদের কস্তুরী বাগানে প্রায় প্রতি রাতেই দু-চারটি চুরি হয়। সেই খবরটা এজহার আকারে ঠোলা মহোদয়ের গোচরে আনয়ন করাও হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ পর্যন্ত কোনো চোর ধরা পড়েছে কিংবা চোরাই মাল উদ্ধার করা হয়েছে এমন সংবাদ আমাদের এখনো কর্ণগোচর হয় নাই।

বর্তমান লেখক তাই সাত দিন চোরের অথবা সাতাত্তর দিন চোরের এক দিন পুলিশের এই মর্মে একটি প্রবচন চালু করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে সে সাফল্যের সাত মাইলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি।

তেমনি ব্যর্থ হয়েছে অপর এক মহাজন ব্যক্তির এক অনন্য সাধারণ সুপারশ। ভদ্রলোক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মারফৎ তার সুপারিশটি জনগণের গোচরে আনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কোনো পত্রিকাই তা ছাপতে রাজী না হওয়ায় তিনি তার সুপারিশটি একটি হ্যাণ্ডবিল আকারে প্রকাশ করেন। ঘটনাটি অবশ্য কয়েক বছরের পুরনো।

তার প্রস্তাব ছিল : সাত দিন চোরের এক দিন সাধুর (মতান্তরে গেরস্থের) এই প্রবচন চালু করতে হবে। তিনি তার হ্যাণ্ডবিলে এই মর্মে যা লিখেছেন আমরা এখানে তার উদ্ধৃতি দিচ্ছি : হালে দেশে ডাকাতদের কর্মচাঞ্চ্য অনেক বেড়েছে। ধুম পড়ে গেছে ডাকাতির। অল্প কয়েক বছর আগেও এমন কাণ্ড আশা করা যেত না। রাজা শশাঙ্কের আমল থেকে নবাব সিরাজদ্দৌলার আমলের ইতিহাস ঘেটে আমরা যে পরিসংখ্যান পাই তাতে চুরি ও ডাকাতির অনুপাত হচ্ছে ১০৭ : ১। ব্রিটিশ আমলে তস্কর ও দস্যুদের কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ অনুপাত লক্ষ করা যায়। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে এ দেশে তখন তস্করদেরই রাজত্ব ছিল। আর ছিনতাই শব্দটির সঙ্গে আমাদের তখন পরিচয়ই হয় নাই। প্রমাণ : হরিনারায়ন বাবুর অভিজ্ঞান থেকে শুরু করে সেদিনের ছোড়া রাজশেখর বসুর "চলন্তিকা" পর্যন্ত কোথাও "ছিনতাই" বলে কোনো শব্দ নেই। সংসদ অভিধানও উল্টেপাল্টে দেখতে পারেন। সেখানেও নেই। সবচেয়ে বড় কথা টোগোর সাহেবের কোনো কবিতাতেও ওই শব্দটা নেই।

সে আমলে ছিনতাই তো ছিলই না। ডাকাতি হত ছিটেফোটা। আর তাই তস্কররা গণধিক্কারের শিকার হলেও ডাকাতদের দেখা হত শ্রদ্ধার চোখে। ভবানী পাঠক, নিজাম ডাকাত, দস্যু মোহন ও তার পুত্র দস্যু স্বপন, দেবী চৌধুরানী এদের নামে সিন্নি পড়ত। কোনো পরিচিত ডাকাত হাটে-বাজারে গেলে, তাদের আহা সেকি খাতির! স্বয়ং নবাব সাহেব পর্যন্ত সেই খাতির দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতেন। তবে দুঃখ এই যে পাড়ার মধ্যে দিনে দু-দশটা চোরের সাথে গেরস্তের আট-দশবার মোলাকাত হলেও দশটা-বিশটা গাঁ ঘুরেও অন্তত একবার সালাম ঠোকার

জন্য ডাকাতের সাক্ষাৎ মিলত না।

চোরদের এই রাজত্ব এখন ইতিহাসের পাতায় সেঁধিয়ে গেছে। তাদের সেই সুদিন আজ অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত। আজ ডাকাতরা তাদের রাজত্বে হামলা চালিয়েছে এবং ইতোমধ্যেই দখল কায়েম করেছে। এখন যে হারে চুরি হচ্ছে হয়তো ঠিক সেই হারে ডাকাতি হচ্ছে না। তবে সেদিন অদূরে নয় যেদিন ডাকাতরা কেল্লা ফতে করবে। প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবে তস্করদের এমনকি আমাদের মনে হয় এমন দিন আসছে যেদিন ডাকাতদের উপর চটে গিয়ে চোরেরা ছেড়ে দেবে এই আদিম অথবা মহান শো।

কিন্তু ডাকাতরা কেবল ডাকাতিই নয়। দানের সঙ্গে আছে দেমন দক্ষিণার সম্পর্ক তেমনি ডাকাতির সঙ্গে আছে খুনের সম্পর্ক। এই তো সেদিন রোমহর্ষক এক ডাকাতি হয়ে গেল সোনালী ব্যাংকের একটি শাখায়। সেই সাথে খুন হল তিন জন।

হ্যাণ্ডবিলে আরও বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে রায়পুরা উপজেলায় এক গণ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। তেরটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। সেখানে ডাকাত দলটি বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে রীতিমতো উৎসব করে যাবতীয় মালপত্র নিয়ে গেছে। তাদের দক্ষযজ্ঞ থেকেউপজেলার মা-বাপ অর্থাৎ নির্বাহী অফিসারও রেহাই পান নি। অন্য বাড়ীগুলোও ছিল সরকারি কর্মকর্তাদেরই। আমরা মনে করি ডাকাতির জন্য ব্যথিত সময়কাল ও সংখ্যার দিক থেকে সোনার বাংলায় এটা একটা রেকর্ড। বর্গীদের হামলার পর আজ পর্যন্ত কোনো থানায় এমন গণ ডাকাতির ঘটনা ডায়েরি করা হয় নি বলে আমরা ঠোলা বিভাগের সদর দফতরে খোঁজ নিয়ে দেখিছি। তবে রায়পুরায় অতবড় ডাকাতিতে কেউ খুন হয় নি। কেউ আহত হয়েছে বলেও শোনা যায় নি। অনুমান করি এরা সবাই ছিল অহিংস ডাকাত।

ডাকাতি কেবল বাড়ি আর ব্যাংকেই হয় বলে যারা মনে করেন তারা নিতান্তই আহাম্মক। তাই যদি হবে তা হলে জলদস্যু শব্দটার উৎপত্তি কেন হবে? নদীবক্ষে ডাকাতি শিরোনামায় খবরই-বা ছাপা হবে কেন? তা ছাড়া আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় "ডাকাতনী" দেবী চৌধুরাণীর কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি পিনহাস থেকে পিনহাসে ডাকাতি করতেন। ফরে যানবাহনের উপর ডাকাতদের কৃপাদৃষ্টি নতুন করে বর্ধিত হয়েছে। এখন তারা প্রবল পরাক্রমে বাস, কোস্টার, স্টিমার, রেলগাড়িতেও তাদের

কর্মদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে।

হ্যাণ্ডবিলে ওই মহাজন ব্যক্তি উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আর্জি জানিয়েছেন : অতএব দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আমাদের সবিনয় নিবেদন, আপনারা চোরের সাত দিন গেরস্থের এক দিন মান্ধাতার আমলের এই বস্তাপচা প্রবচনকে বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে নতুন প্রবচন গঠন করুন। সেই প্রবচনটি হবে ডাকাতের সাত দিন আর গেরস্থের (বা সাধুর) এক দিন।

দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর পার হয়ে গেছে সেই হ্যাণ্ডবিলটি প্রকাশের পর। কিন্তু প্রবচন বদলের সেই উদাত্ত সুপারিশে কেউ কান দেয় নি।

ইতোমধ্যেই ছিনতাই-এর পেশা দারুণ জমে উঠেছে, খুবই জনপ্রিয় হয়েছে আজকাল। ক্রমেই বেশি করে লোক সেই পেশায় ফ্রি যোগ দিচ্ছে। আমাদের কস্তুরীবাগানে সম্প্রতি যেসব কর্মকাণ্ড ঘটেছে তাতে দেখা গেছে সেখানে চুরি অপেক্ষা ছিনতাই কয়েক গুণ বেড়েছে। অথচ কোনো ছিনতাইকারীকে ধরা হচ্ছে না? চোখের নিমেষে কাজ হাসিল করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। শুনছি কোনো-কোনো চোরও নাকি তাদের পেশায় ইতি দিয়ে এখন ছিনতাই বৃত্তিতে অংশ নিয়েছে এবং রাতারাতি সাফল্য অর্জন করেছে।

এক্ষেত্রে তাই বর্তমান লেখকের আবেদন : সাত দিন ডাকুর আর এক দিন সাধুর বা সাত দিন চোরের এক দিন পুলিশের প্রবচন চালু না হয় না করলেন সেক্ষেত্রে সাত দিন ছিনতাইকারীর আর এক দিন সাধুর (গেরস্থের) বা পুলিশের প্রবচনটি অন্তত চালু করুন।

বিশেষ বক্তব্য : তাও যদি করতে ইচ্ছে না করে তা হলে দেশবাসী ভাই ও বোনেরা আমার, সাত দিন বোমাবাজের আর এক দিন সাধুর এই নতুন প্রবচনটি চালু করলেও আমার দুঃখ থাকবে না।

এবং বাবর বাদশাহ
সালেহ চৌধুরী

'এবং' একটি অব্যয় পদ। বৈয়াকরণেরা তার পরিচিতি আরো স্পষ্ট করেছেন সংযোগী অব্যয় নাম দিয়ে। জোড়াতালির এ সংসারে পদ আর বাক্যেরও জোড়া লাগানোর দরকার পড়ে। তা কোনো আঠাই তো আর এখানে কাজে খাছে না, সেও এক ল্যাঠা। ও ল্যাঠা চুকানোতেই সংযোগী অব্যয়ের স্বার্থকতা। 'এবং' দিয়ে তাই কিছু শুরু হয় না। সর্বাবস্থায়ই তার অবস্থান অন্তর্বর্তী। তবে হ্যাঁ ডানে কিংবা বামে যার কিংবা যাদের থাকার কথা, স্থল বিশেষে অনুক্ত থাকতে পারে। যেমন রয়েছে এই লেখার শিরোনামে।

আছে, তবু বলি নি। অনুক্ত রেখেছি। সে কেবল ওই চক্ষু লজ্জার খাতিরে। সেরা মোগল বাবর বাদশার সঙ্গে এই আমিটা'কে জুড়ে দিতে একটু বাধে বইকি; তা বিষয় খোলাসা করেই তো বয়ানে নামতে হবে, সে জন্যেই এই ভনিতা। তবে ভনিতার ধানাইপানাই যত কথাই বলি, বলতে যখন শুরু করেছি, সাফ কথাই বলব।

স্বীকার আমাকে করতেই হবে, ইদানিং কাগজ খুললে ওই যে 'রাশিচক্র' কিংবা 'আপনার ভাগ্য' জাতীয় রাশি-রাশি খাস্তা মাল ছড়ানো থাকে তাতে আমার চোখও আটকায়। চট করে চোখ বুলিয়ে নিই। মাঝে-মধ্যেই ইচ্ছে পূরণের আশ্বাসও পাই। দিনের প্রথম ইচ্ছাটিকে অপূর্ণ রেখেছি, দিবস যদিও তার যাত্রায় ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আমার ইচ্ছে খুব বড় কিছু না। ঘুম ভাঙতেই খবরের কাগজটা হাতে পাব দীর্ঘ দিনের সাধ। আহা, ভাগ্য নিয়ে নিত্যদিন অত কথা যারা জানাচ্ছেন, যদি একদিন বলে দিতে পারতেন, কবে তারা পাঠকের হাতে যথা সময়ে পৌছবেন।

উহু, কাগজ পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। ওই একটি বিষয়ই আমায় বুঝিয়ে ছেড়েছে, কোনো বুদ্ধির শরণই যথেষ্ট নয়, একইসঙ্গে সংঘেরও শরণ নিতে হবে। সংঘ শক্তি বলে কথা। এখন তো তবু দুপুরের আগে-আগে আমার বাসায় কাগজ আসছে, রাত্তিরে ঘরে ফিরে চোখ বুলানোর অবকাশ পাচ্ছি, বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে ওটুকুও হারাতে চাই নে। কেবল তো আর কাগজের পাতায় না, ফুটপাথ থেকে অভিজাত আবাসিক এরাকা ফলিত জ্যোতিসের ফলাও বারবার কোথাও চলছে না? আর তবে তো খবর আগাম জেনে আমাদের তো বগল বাজিয়ে নেচে বেড়ানোর কথা। এ নিয়ে ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করার মওকাও কি আছে, খোদ ইসলামের সঙ্গে এর কেনো বিরোধ নেই, এমন ফতোয়াও জারী হয়েছে বিস্তর। আর গুটিকয় যদিও 'অপসংস্কৃতি' 'অপসংস্কৃতি' বলে গলা চড়ানোর কোশেশ করেন, ওদের সঙ্গেও সুর মেলানোর ভরসা পাইনে। পাইনে কেননা ওই 'অপসংস্কৃতি' শব্দটাকেই ভয় পেয়ে যাই– সোনার পাথর বাটির মতো এ-ও যে আরেক অসম্ভব।

আমার হয়েছে এই আরেক মুশকিল, শব্দেও হোঁচট খাওয়াই কেবল নয়, মুখ থুবড়ে পড়ার দশা। যদিও দশাশই বুদ্ধিজীবীরাও 'অপসংস্কৃতি'র তোলবোল তুলতে পিছপা নন। আমার তাই করা হয় না। সাবেক অবস্থানে অনড় আমি হঠাৎ করেই বাবর বাদশাকে পেয়ে যাই একান্ত কাছে। কেমন করে, সে কথাই বলছি।

সদ্য কৈশোর ছাড়ানো বাবর দ্বিতীয় বারের মতো তার খানদানের মর্যাদা নগরী সমরখন্দ জয় করেছেন। গুছিয়ে বসতে না বসতেই খবর এল সাইবেরিয়ার দিক থেকে দেয়ে আসছে মোঙ্গল সর্দার সাইবানী খান। মায়ের দিক থেকে আত্মীয় হলে কি হয় চেঙ্গিস খানের বংশধর তো বটে, সাইবানীর কাছে মায়া-মমতা বলে কিছু নেই। বাবর প্রমাদ গুনলেন। চারদিকে কুটুখে সবার কাছে সদত চেয়ে দূত পাঠালেন। আর নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ছুটলেন নগরীর বাইরেই সাইবানীকে ঠেকাতে।

এর আগে আরো একটা কাজ করে নিয়েছিলেন। দরবারের

জ্যোতিষদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন আসন্ন লড়াইয়ের ফলাফল। বিস্তর আঁক আর মাপজোক কষে জ্যোতিষীরা মোক্ষম সময়টা বেছে দিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান আর বাবরের রাশির প্রভাব মিলে এ সময়টায় যুদ্ধ হলে সাইবানী তো ছাড়, বাবরের তাবৎ দুশমন নির্ঘাত কচুকাটা, জয় সুনিশ্চিত।

নিজ ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে বাবর যখন সাইবানীর মুখোমুখী পৌঁছালেন, কোনো সাহায্য তখনও পৌঁছায় নি, মূল বাহিনীও বেশ পিছিয়ে আছে। এ দিকে কি সর্বনাশ, জয়ের সোনালী সময় সমাগত। বাহিনী না পৌঁছালেও জ্যোতিষদের নির্ধারিত সময় হয়ে গেছে।

নিশ্চিত জয় তো আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাবর তাই যেটুকু লোকবল হাতের কাছে ছিল তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে।

বেঁধে দেওয়া সময়েই লড়াই হল। ফলাফল কচুকাটাও রইল ঠিক। কেবল দিকটা একটু বদলে গেল। বাবর সবকিছু হারিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন।

সেই যে পালানোর শুরু, ওই পালাতে-পালাতেই কাবুল হয়ে আগ্রায় এসে ঠেকা। তা আগ্রাতেও আবার পালানোর তাড়া। হয়েছে কি, বাবরকে যারা হিন্দুস্তানে দাওয়াত করে এনেছিলেন ওদের ধারণা ছিল বাবার ইব্রাহীম লোদীকে খতম করে তার পূর্ব পুরুষ তৈমুরের মতো লুটপাট করে ফিরে যাবেন। হিন্দুস্থানের রাজ্যপাট তখন নতুন করে সাজিয়ে নিলেই চলবে।

তা বাবর এলেন, লোদীদের খতমও করলেন। কেবল ফিরে যাওয়ারই নাম নেই। আগ্রায় বেশ গ্যাট হয়ে বসারই কোশেশ চলছে। দাওয়াতকারীরা এবার রানা সিং বা সংগ্রাম সিংহের নেতৃত্বে জড়ো হলেন। বাবরকে তাড়িয়ে হিন্দুস্তানের তখন উদ্ধার করতে হবে।

খবর এল তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে সংগ্রাম সিংহ আসছেন। বাবরের সঙ্গে মাত্র হাজার কয়েক লোক। তাও ওরা এ গরমের দেশ ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। লড়ার ইচ্ছা কারো নেই।

বাবর আবার তার জ্যোতিষদের ডাকলেন। ভবিষ্যৎ জেনে দিতে ওদের বিশেষ দেরি হল না। এক বাক্যে সবাই জানালেন, বাদশা নামদার গ্রহ-নক্ষত্র সবাই বিরূপ। লড়াই মানে খতম। কাবুলে পালালেই উত্তম।

পালানোর কথা হয়তো বাবরও বিবেচনা করেছিলেন, তাই ওটা

অসম্ভব বুঝতে তার দেরি হল না। আগ্রা থেকে কাবুলে পৌঁছতে দেড় মাসের মতো সময় দরকার্ পেছনে শত্রু নিয়ে এ দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতটা সময় ওরা দেবে না। তাই পালানো নয়, বাঁচার পথ একটাই যুদ্ধ করা এবং জেতা। বাবর নিজে বুঝলেন, সঙ্গীদের বুঝালেন।

ফলাফল ইস্কুলে পড়া ছেলেরাও জানে। বাবরনামার পাঠকেরা তো বিস্তারিতই জ্ঞাত। নতুন করে বলার আমারও কিছু নাই। কেবল একটা প্রশ্ন জাগে, আমার পথের পাশে বসে থাকা যে লোকটা দুনিয়ার তাবত লোকের ভাগ্য জানিয়ে দিতে ব্যাগ্র, নিজের ভাগ্যের খবরটা সে জানছে কবে।

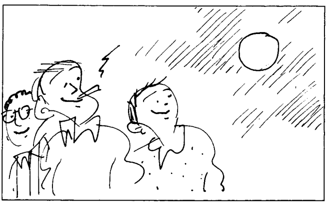

নববর্ষের চাঁদের আলোয়

খসরু চৌধুরী

অনেক দিনের কথা। '৭৬-'৭৭ হবে। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বন্ধুবান্ধবের কেউ-কেউ গিয়ে ভর্তি হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সূত্রে সুযোগ পেলেই সুড়ুৎ করে ঢাকা চলে যাই। সেবার ঢাকা যেতে পূর্ণিমা পড়ল নববর্ষের দিনে। আমরা তিন বন্ধু– আমি, মারুফ আর অপি ঠিক করলাম, আজ আমরা ঘুরব মহানগরীর পথে-পথে।

যে-ক'দিন ঢাকা থাকি, প্রতিদিনই আড্ডা মারি ধানমণ্ডি লেকের পাশে। তবে তার একটা সময়সীমা থাকে। মোটামুটি রাত দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে আমরা মহসীন হলে ফিরে আসি। কিন্তু সে রাতের প্রথম শর্তই হল– আজ কোনো সময়সীমা থাকবে না।

মানুষ বোধহয় বোহেমিয়ান হতে চাইলেও নিজের অজান্তেই কিছু অভ্যেস ত্যাগ করে উঠতে পারে না। আমরাও পারলাম না। প্রথমেই গেলাম ধানমণ্ডি লেকে। বসার পরপরই মারুফ গলা ছেড়ে গান ধরল–

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে উচলে পড়ে আলো
ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো–

প্রথম দু' লাইন দু'বার গাইতেই অপি বলল, 'দোস্ত, মাফ করে দিলে হয় না?'

'তার মানে?' কটমট করে তাকাল মারুফ।

'না, মানে বলছিলাম কি, তোর যে গলা, গান শুনে আশেপাশের কাকেরা আবার উৎসাহ পেলে এখানে বসে থাকাই মুশকিল হবে। তার চেয়েগত কালই আমি একটা কবিতা লিখেছি, শোন।'

পকেট থেকে একটা পেন্সিল-টর্চ আর কবিতার খাতা বের করে আবৃত্তি শুরু করল অপি–

আকাশ-গভীর চোখে সে চেয়ে থাকে
ব্রহ্মাণ্ডের বিষণ্নতা মাখা দৃষ্টান্তহীন দৃষ্টিতে
বলে, কষ্ট দিলাম বুঝি?
দেখি তখন অতল অনুভবে
তার কষ্টের ক্যানভাসে আমার কষ্টের রঙ।

এ-পর্যন্ত আসতেই হাত তুলল মারুফ। 'তোকে একটা কথা বলব, শুনবি?'

আবৃত্তিতে বাধা দেওয়ায় একটু আহত হয়েছে অপি। 'কী কথা?'

'তোরা, মানে বাংলাদেশের কবিরা তো কাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিস, চেহারাতেও কবি-কবি ভাব ধরে রাখা চাই। উষ্কখুস্ক চুল, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি, কত কি যে আবার থাকে সেই পাঞ্জাবির পকেটে– কাগজ, বলপেন, কারেকশন ফ্লুইড, গাঁজার কলকি। তবে একটা কার্যকরী জিনিস রাখার কথা তোদের কোনো কবির মাথাতে আসে নি।'

'কী জিনিস?'

'থান ইট। বিশ্বাস কর, দোস্ত, এখন থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে একটা থান ইট রাখিস। লিখতে-লিখতে যখন ভাবের অভাব পড়বে, ওই ইট দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে মাথায় তিনটে বাড়ি দিবি, দেখবি বন্যার পানির মতো ভাব আসছে।'

'এই শালার সায়েন্সের ছাত্রগুলোকে এজন্যেই আমি দু' চোখে দেখতে পারি না', অপি ফুঁসে উঠল।

গলা চড়াল মারুফও। 'শালা, তোকে কে বলেছে রে সায়েন্সের ছাত্ররা কবিতা বোঝে না? কবিতা কি তোদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাকি?'

আমি দেখলাম পরিস্থিতি সুবিধের নয়, হস্তক্ষেপ না করলে আনন্দটাই

মাটি হয়ে যাবে। তাই ধমকে উঠলাম, 'নো ক্ল্যাশ টু নাইট!'

অপি বলল, 'কবিতার ব্যাপারে কবিরা যে কী রকম দুর্বল থাকে তুই তো বুঝবি না, তা ছাড়া আজ আমার মনটাও একটু খারাপ।'

'কেন?'

'সকালে কলাবাগান গিয়েছিলাম। খালাতো বোনটা বুঝলি, আমার সামনে এই সেদিন ওড়না পরা ধরল, ইতোমধ্যেই সেয়ানার একশেষ হয়েছে। সাহস করে আজ কথাটা বলতেই হারামজাদী কী বলল জানিস? বলল, অপি ভাই, এত সুন্দর চেহারা আপনার, কী চমৎকার সব কবিতা লিখেন, কিন্তু দাঁতের অবস্থা এমন করুণ কেন? টুথপেস্টের ডেট এক্সপায়ার করেছে বুঝি? হারাম–'

'যা হবার হয়েছে। নববর্ষে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি চাঁদের আলোয়, আজ রাতে কোনো ঝগড়া নয়। মারুফ, তুইও আর ঝগড়া করতে পারবি না, মনে থাকে যেন।'

'বেশ। চল এখান থেকে উঠে পড়ি।'

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গেলাম সংসদ ভবনের সামনে। সেদিকে আঙুল তুলে মারুফ বলল, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কী জানিস? রাজনীতিবিদদের জন্যেই শ্রেষ্ঠ জায়গাগুলো বরাদ্দ করা থাকে।'

'বাজে প্যাচার পাড়ার অভ্যেস তোর কবে যাবে বল তো!' আবার ধমকালাম আমি।

'বাজে প্যাচাল? সেই বিখ্যাত গল্পটা তুই শুনিস নি?'

'কোন গল্প?'

এক কৃষকের দু'টো পাঁঠা ছিল। বেচারা গরিব, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এক দিন হঠাৎ করে এক বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। পাঠা দু'টোকে ছোট্ট একটা খুপরির মধ্যে ঢুকিয়ে সে ঘোষণা দিল, যে ওই খুপরির মধ্যে পাঁঠা দু'টোর সঙ্গে কাটাতে পারবে তাকে সে পঞ্চাশ টাকা দেবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার আগে বেরিয়ে এলে তাকেই পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। সেই খুপরির একটাই মাত্র দরজা, কোনো জানালা নেই।

প্রথমে ব্যাপারটাকে সহজ ভেবে পঞ্চাশ টাকার লোভে অনেকেই গেল। কিন্তু পাঁঠার গায়ের গন্ধ তো জানিসই, কেউ পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারল না। কৃষকের কপাল খুলে গেল। চমৎকার আয় হতে লাগল তার।

অবশেষে এল এক লোক। বলল, 'আপনার ঘোষণা শুনে অনেক দূর থেকে আমি এসেছি। পাঁঠা দু'টোর সঙ্গে যদি এক ঘণ্টা থাকতে পারি, তা হলে আপনি আমাকে কত দেবেন?'

লোভে চকচক করে উঠল কৃষকের চোখ। 'পাঁচশ টাকা দেব।'

'থাকতে না পারলে আমিও আপনাকে পাঁচ শ' টাকা দেব,' বলে লোকটা ঢুকে গেল খুপরির ভেতরে।

গ্রামে কথাবার্তা খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়, দেখতে-দেখতে লোক জমে গেল খুপরির চারপাশে।

"এক ঘন্টা গেল; দু' ঘন্টা, তিন ঘন্টা। অবাক হয়ে গেল সবাই। চার ঘন্টা পর দেখা গেল, পাঁঠা দু'টোই খুপরি থেকে বেরিয়ে আসছে ফোঁৎ ফোঁৎ করতে-করতে।"

"লোকটাকে পাঁচ শ' টাকা গুনে দিতে-দিতে কৃষক বলল, 'আপনার পায়ে সালাম, আমার পাঁঠার সঙ্গে শুধু যে চার ঘন্টা কাটিয়েছেন তাই নয়, পাঁঠাই বেরিয়ে এল আপনার গায়ের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে। ভাই, আপনার পরিচয়?'

গম্ভীর জবাব এল, 'আমি একজন রাজনীতিবিদ।

হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ার অবস্থা আমার আর অপির। পরিবেশ একেবারে হালকা হয়ে গেল।

আবার পা বাড়ালাম আমরা। ফার্মগেট, কাওরান বাজার, হাতিরপুল হয়ে ভূতের গলি। নাম মাহাত্ম্যের কারণেই কিনা জানি না, এখানে ঢুকতেই আমার ভূতের কথা মনে পড়ে গেল।

বললাম, 'ভুতের গল্প শুনবি?'

ভ্রূ কুঁচকে মারুফ তাকাল অপির দিকে। 'খসরুটা আর সাবালক হল না বুঝলি, ভূতের গল্প শোনাবে। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?'

'ভূত আছে কি না তা আমার জানার কথা নয়,' বললাম আমি, 'গল্প শুনেছি দাদার মুখে। শুল ঝেড়ে থাকরে তার যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁর, আমার নয়। 'আজকালকার ছেলেমেয়ে' বলে সব দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপালেও শুল ঝাড়াসহ সব ধরনের অপকর্মে বুড়োরাও কম যায় না।'

'বল দেখি তোর গল্প,' একটা সিগারেট ধরাল অপি।

আমিও সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লাম এক গাল। "দাদা তখন যুবক। দোতলার একটা ঘরে একলা থাকেন। গরমে রাত। এপাশ-ওপাশ

করছেন, কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। তাই ভাবলেন, বই পড়বেন। বই পড়তে শুরু করলে অনেক সময় বেশ ঘুম ধরে। যত আঁতেল বই তত চমৎকার ঘুম। বিছানা চেড়ে উঠে পড়লেন তিনি। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই মিশমিশে কালো এক বুড়ো চট করে ঢুকে গেল বইয়ের আলমারির পেছনে।

চোর ভেবে আঁতকে উঠে দাদা বললেন, 'এই, এই, এত রাতে তুই কে রে?'

'জ্বী, আমি ভূত।'

জবাব শুনে দাদার তো চক্ষু চড়কগাছ। ভূত! ভাবলেন, শয়তানী করে কোনো চোর কি মিথ্যে কথা বলছে? এইসময় কালো মাথাটা আলমারির আড়াল থেকে একবার উঁকি দিয়েই আবার হারিয়ে গেল। এরকম মাথা বের করে আবার টেনে নিয়ে লুকোটুরি করতে লাগল বুড়োটা। চেঁচিয়ে উঠলেন দাদা, 'ঠিক করে বল, কে তুই?'

'জ্বী, আমি ভূত।' একই জবাব ভেসে এল।

এবার দাদার মনে হল, কথাটা সত্যি। কারণ, আলমারির পেছনের এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষেই ঢোকা সম্ভব নয়।

গলা নরম করে দাদা বললেন, 'তুই ভূতই যদি, অমন বার বার লুকোচ্ছিস কেন?'

করুণ সুরে তখন ভূতটা বলল, 'আমার বয়স চার শ' বছর। এ-যাবৎ আমার ধারণা ছিল, ভূতেদের চেহারাই সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে বিশ্রী চেহারার মানুষও ভূতের তুলনায় সুন্দর। কিন্তু আজ আপনাকে দেখে আমার সে-ধারণা ভেঙে গেল, তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না, ভাই।'

হো হো হো হা হা হা হি হি হি শুরু করল মারুফ আর অপি।

ভূতের গলি থেকে বেরিয়ে মালিবাগ পেলাম আমরা। তারপর ডি.আই.টি. এক্সটেনশন রোড হয়ে মতিঝিল, টিকাটুলি, গুলিস্তান, মেডিকাল। শহীদ মিনারটার সামনে আসতে আসতে অপি বলল, 'ক'টা বাজে দেখ তো?'

'আড়াইটা,' ঘড়ি দেখলাম আমি।

যথেষ্ট হয়েছে ভেবে এবার হল অভিমুখে পা বাড়াতেই আমরা পড়ে গেলাম টহল পুলিশের সানে।

অপি বলল, 'ব্যাটারা আমাদের ধরতে পারে।'

'ধরবে না,' জবাব দিল মারুফ।

'কীভাবে জানলি?'

'প্রকৃত বিপদগ্রস্থকে পুলিশ উদ্ধার করে না। দেখ, এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

এগিয়ে গেল সে পুলিশের দলটার দিকে। তারপর সোজা একজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'ও পুলিশ ভাই, আমরা গ্রামে থেকে নতুন এসেছি। চাচার বাড়ি যাব। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আপনি আমাদের চাচার বাড়ি পৌঁছে দিন।'

এরকম আপদের হাতে এরা বোধহয় আগে কখনও পড়ে নি। তাড়াতাড়ি পা বাড়াতে যেতেই পেছন থেকে সে আবার ঝাপটে ধরল কর্মকর্তাটিকে, 'ও পুলিশ ভাই–'

'যান, বাড়ি যান, ভদ্দরলোকের ছেলে না আপনারা!' দ্রুত পা চালিয়ে দল নিয়ে কর্মকর্তা হারিয়ে গেল রাস্তার মোড়ে।

রাত চমকে উঠল আমাদের হাসিতে।

হেঁচকি তুলতে-তুলতে আমি বললাম, 'ভালোই দেখালি যা হোক।'

ভীষণ আনন্দ হল সে-রাতে। তবু মহসীন হলের সামনে আসতেই আমাদের তিন জনেরই মন খারাপ হয়ে গেল।

অপি কবি মানুষ। খুবই বিষণ্ণগলায় বলল, 'জীবনের আর কোনো নববর্ষে কি এমন পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্না গিলতে-গিলতে ঘুরতে পারব আমরা?'

চুপ করে রইলাম আমি আর মারুফ! ওর প্রশ্নের জবাব আমাদের কারোরই জানা নেই।

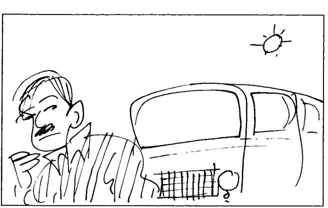

দূরপাল্লার বাস ভ্রমণ
আনিসুল হক

দূরপাল্লার বাসে যাতায়াত করার ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই ব্যাপক। আমি ঢাকা-রংপুর, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-খুলনা রুটে বিস্তর বাসজার্নি করেছি।

একবার হল কি-ঢাকা থেকে রংপুর যাব। তিন দিন আগে টিকেট করতে হয়, করলাম। সকাল সাতটায় বাস। সাতটা বাজার পাঁচ কি সাত মিনিট আগে গাবতলী পৌছালাম। নির্দিষ্ট বাসে উঠে দেখি আমার সিটে অন্য লোক বসে আছে। আমি বললাম, 'ভাই, এটা তো আমার সিট। আমি তিন দিন আগে টিকেট কেটেছি।' তিনি তার টিকেট বের করলেন। দেখা গেল, তারও এই সিটই। বাসঅলারা একই সিটের জন্যে দুটি টিকিট বেচেছে। আমি রাগীস্বরে ডাকাম সুপারভাইজারকে, 'এই মিয়া, এই সিটে দুটো টিকিট ছেড়েছ কেন?' সে উদাস ভঙ্গিতে বলল, 'আমি টিকিট বেচি নাই। কাউন্টার থাইকা বেচছে। আপনে টিকিটঘরে যান, বাস একটু পরে ছেড়ে দেবে।' আমি টিকেট ঘরে যাব? পড়িমরি দৌড়ে গেলাম। কাউন্টার ফাঁকা, কেউ নেই। আবার দৌড়ে এলাম বাসে। আমার আম-ছালা সবই বুঝি যায়।

ইঞ্জিনকাভারে বসে অতিকষ্টে যাত্রা সম্পন্ন করতে হল। ইঞ্জিনকাভারে বসলে যে আমার জাত যাবে, তা তো নয়। মুশকিল হল, বাস খানিক চলার

পর ইঞ্জিনকাভার খুব গরম হয়ে যায়। নিতম্বের ওপর দিয়ে খুব একচোট ধকল যায়। আমারো গেল। কান ধরলাম, এরপর আর দেরি করে বাসে উঠব না। এক ঘন্টা আগে বাসে উঠে সিট দখল করে রাখব।

পরের বার ঢাকা-রংপুর বাসের সময় সকাল ছয়টায়। নির্দিষ্ট বাসে গিয়ে বসলাম। হলের সিট দখল নিতে কত রক্তারক্তি করতে হয়, আর বাসের সিটের জন্যে আমি এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে পারব না? ভোর হচ্ছে গাবতলিতে। নাইটকোচে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসা মোরগগুলো ডাকতে শুরু করেছে। তাদের প্রাতঃক্রিয়ার দুর্গন্ধে নাকে রুমার দিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না। পাশের ইটালিয়ান হোটেলে বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। সেটার সুগন্ধও এসে নাকে জায়গা খুঁজছে। খানিকপরে আরো দু'-চার জন যাত্রী এসে উঠলেন। সাতটা বাজতে চলল। আমি আমার সিট দখল করে মনে-মনে গান গাইছি– দেখা আরিচাঘাটে, শাহাজালাল ফেরিতে, রংপুরিয়া চ্যাংড়া বন্ধুর সাথেরে।

এমন সময় একজন 'বাসের লোক' এসে বলল, 'এই বাস যাবে না। আপনারা আমার সঙ্গে আসেন।'

বলে কি লোকটা? ব্যাগট্যাগ নিয়ে তার পিছে-পিছে ছুটতে হল। তিনি অন্য একটা বাসের দরজা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে গেলেন। বেশি টিকিট বিক্রি হয় নি বলে দুটো বাসের বদলে একটা বাস যাবে। এই বাস আগে থেকে অর্ধেক ভরা। আমি ভেতরে প্রবেশের আগেই বাকি সিট ভরে উঠল।

দূরপাল্লার যাত্রায় অনেকে নাইট কোচকে অগ্রাধিকার দেন। আমার অবশ্য ডে কোচই ভালো লাগে। এর কারণ, নিখাদ ঈর্ষা। নাইট কোচ ছেড়ে দেবার খানিক পরে বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, সমস্ত বাস একযোগে ঘুমিয়ে পড়ে। আমার পাশের যাত্রীটি মহানিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে আমার কাঁধটাকে বালিশ ভেবে নাক ডাকতে শুরু করে দেন। জেগে থাকে মাত্র দু'জন। একজন ড্রাইভার। দ্বিতীয় জন আমি।

বসে-বসে ক্যাসেট প্লেয়ারের গান শুনি। বাংলা সিনেমার গান সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল নাইট কোচে যেতে-যেতে। একটা গান হল : 'আমার লাখ টাকার বাগান খাইল দেড় টাকার ছাগলে।' আরেকটা গান প্যারোডি। 'ওরে ও কলাঅলা, তোর কলা বিচি কলা, খাইতে ভালো লাগে

না।' উদাহরণ বাড়াতে চাই না।

তো আমি ডে কোচ বেশি পছন্দ করি। দু' ধারের ধানক্ষেত দেখতে-দেখতে যাই। আর যেখানেই বাস থাকে, ফেরিঅলার কাছ থেকে খাবার কিনে খাই। ঝালমুড়ি, আমড়া, আখ, সেদ্ধ ডিম ইত্যাদি। অবিরাম ভক্ষণ। এ-কারণে আমি একা-একা চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করি। কোনো ভদ্রলোককে পাশে রেখে এ-সব অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া কি ঠিক?

এবার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার সময় পাশের সিটে পেলাম একজনকে। তিনি বাঙালি, বগুড়ার শান্তাহারের লোক, কিন্তু সেটল করেছেন পাকিস্তানে। বাংলাদেশ থেকে আম কিনে নিয়ে যাবেন। দাউদকান্দি ফেরিঘাটে তিনি আম কিনলেন। অনেকগুলো আম। আমাকে সেই আম খাওয়াবেনই। সহযাত্রী কোনো কিছু খাওয়াতে চাইলে খাবে না– এটা বাসে চড়ার দেশী নিয়ম। কিন্তু এ-লোকের পিড়াপিড়িতে না-খেয়ে কোনো উপায় রইল না। মুখে দিয়ে দেখি অতি জঘন্য আম। টক হলে তো কথা ছিল। টকও না, মিষ্টও না। পানির মতো স্বাদ। ভদ্রলোক বড়ো আশা নিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন– 'ভালো না? খুব মিষ্টি না?' বিস্বাদে আমার মুখ তখন বিকৃত। অতি কষ্টে বললাম, 'হ্যাঁ, খুব মিষ্টি।' তিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে বললেন, 'মিষ্টি হতেই হবে।' আম কিনতে হয় দেখে। এই যে দেখছেন বোঁটার কাছটা ভরা-ভরা, এই ধরনের আম মিষ্টি হয়।'

একটা সময় ছিল, যখন আমরা তিন ভাই ঢাকায় থাকতাম। ঈদে প্রত্যেকেই বাড়ি যাবে। আমরা তিন ভাই তিনটা বাসে চড়তাম। দোয়াদরূদ পড়েই চড়তাম। এটা হল ঝুঁকিটা ছাড়িয়ে দেওয়া। তিন ভাই যদি একসঙ্গে মারা পড়ি, বাবা-মা বড়ো কষ্ট পাবেন যে। শেয়ার মার্কেটে এইভাবে বিনিয়োগ করতে হয়। একই কোম্পানির শেয়ার বেশি করে না-কিনে তিন-চারটা কোম্পানির শেয়ার কিনুন। একটা মারা পড়লে যেন অন্যটা বেঁচে থাকে।

আমি ঢাকায় একটা দৈনিক সংবাদপত্রে কাজ করি। একবার আমার শখ হল আমার পড়াশোনা যে-ক্ষেত্রে, সে-পেশায় ফিরে যাব। ইঞ্জিনিয়ারিং করব। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরি পেলাম রেলে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে একাডেমিতে ট্রেনিং। দিন পনের চট্টগ্রামে ছিলাম। এই পনের দিনে আমি মোট দশ বার ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা বাসে যাতায়াত করলাম। রেলের

কর্মচারি হিসেবে রেলের টিকেট বিনে পয়সায় পাওয়াটাওয়া যায়। এইসব ঝামেলা কে করে? তা ছাড়া বাসে চড়ে যখন-তখন আসা-যাওয়া করা যায়। আমার থাকার কথা চট্টগ্রামে দেখা গেল আমি ঢাকায় এসে আমার সংবাদপত্র অফিসে বসে আছি। আমার মনের অবস্থা আল্লাহতালা বুঝলেন। আমার জ্বর হল। আমি আর চট্টগ্রাম ফিরে গেলাম না। জ্বরের বিষয়ে আল্লাহতালা আমার মন বুঝে চলেন। আমি যখনই চেয়েছি এখন আমার অসুখ হোক, হয়েছে। যেমন এ লেখাটি লিখছি জ্বরের ঘোরে। এই জ্বরটা আমি বলে কয়ে স্যাংশন করেছি। তো শেষবারের মতো চট্টগ্রাম যেতে হল আমার জিনিসপত্র সব ফিরিয়ে আনতে। আসার সময় এসি বাসের টিকেট কিনলাম। খুবই ভালো ব্যবস্থা। সুপারভাইজাররা সুদর্শন। মিনারেল ওয়াটার, কোক, কেক। নানা উপাদেয় খাবার। আমার চট্টগ্রাম থেকে ফেরার দিনটি স্মরণীয় হয়ে রইল।

বহু দিন বাসেটাসে ওঠা হয় না। কিন্তু এবার বিটিভির ঈদের নাটকের পর খুব বাস যাত্রার স্মৃতি মনে পড়ছে। ঈদের নাটকটা, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার লেখা ছিল। আমার স্ক্রিপ্টে প্রথম দৃশ্য ছিল, কী-হোলের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে খাকি পোশাক। বি. দ্র. : এটা যে ডাকপিয়ন তা দর্শকরাও বুঝবে না। তাদেরকে রহস্যের মধ্যে রাখা হবে। বাস্তবে যখন শুটিং শুরু হল, তখন দেখা গেলো কী-হোল নেই। কী-হোল তো নেই-ই নেই, সেটের দরজায় কোনো কপাট নেই, শুধু পর্দা ঝুলছে। একটা দৃশ্য নাটকে দেখান হল ৪০ সেকেণ্ড ধরে, পোস্টার লাগানোর দৃশ্য। আসলে এডিটিং-এর সময় এই ৪০ সেকেণ্ড রেখে দেওয়া হয়েছিল–একটা ট্রেন আসছে– এই দৃশ্য যুক্ত করা হবে বলে। কিন্তু সমস্ত টেলিভিশন খুঁজে একটা ট্রেনের শট যোগাড় করা গেল না। একদিন রেলের চাকরি ছেড়ে এসেছিলাম অবজ্ঞায়, আজ রেলগাড়ি তার প্রতিশোধ নিল। শুধু কি ট্রেনের শট? টেলিফোনের সাউণ্ড পর্যন্ত বিটিভিতে পাওয়া গেল না। অথচ সময় নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটক জমা দিতে হবে।

নাটক দেখানোর পর প্রতিক্রিয়া হল ভয়াবহ। এক পত্রিকায় লিখল, ওই অভিনেত্রী ওড়না পরেন নাই কেন? এর দ্বারা নাট্যকার কী বোঝাতে চেয়েছেন? কোনো অভিনেত্রী ওড়নাটোড়না পরবে সেটাও কি নাট্যকারকে বাসা থেকে এনে দিতে হবে? বইয়ের ওপর নাটক হচ্ছে, টিভিতে কোনো

ভালো বই নেই। সব স্কুলের নোট বই। আমি বাসা থেকে বই নিয়ে গিয়েছিলাম বটে।

এসব দেখে-শুনে আমার এক বাসের কণ্ডাক্টরের কথা মনে পড়ছে। সেবার ডে-কোচে চড়ে রংপুর যাচ্ছি। পথিমধ্যে একজন যাত্রী পরার কাপড় নোংরা করে ফেলেছেন। বাস থামানো হল। ওই যাত্রী তার সঙ্গের দু'-তিন জনসমেত নেমে গেলেন পথের পাশের বাড়িতে, কাপড় পাল্টাতে। তাদের ফিরতে দেরি হচ্ছে। এদিকে বাসের সবাই অস্থির, 'ওই কণ্ডাক্টর, বাস ছাড়ে না কেন?'

কণ্ডাক্টর বলল, 'প্যাসেঞ্জার না ফিরলে আমি কী করব?'

একজন যাত্রী বলল, 'তুমি গিয়ে প্যাসেঞ্জারকে তাড়াতাড়ি ডেকে আন।'

কণ্ডাক্টর হেসে বলল, 'এরপর বললেন, প্যাসেঞ্জারের বাড়ি গিয়ে তার কাপড় ধুয়ে নিয়ে আস।'

যে-টেলিভিশনের একটা রেলগাড়ির শট নেই, একটা টেলিফোনের রিঙের সাউণ্ড নেই, নাট্যকারকে কি এরপর সে-সবও দিয়ে আসতে হবে নাকি? বলুন, নাট্যকার টিভিতে গিয়ে পাত্র-পাত্রীর কাপড়ও কেচে দিয়ে আসুক?

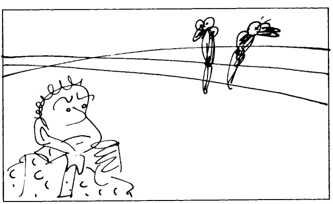

কাকস্য
বিপ্লব দাস

কথায় বলে উড়ে এসে জুড়ে বসা।

তা, এ-কথাটি অন্তত স্বার্থকভাবেই ব্যবহার করা যায় কাকের ক্ষেত্রে। পক্ষী সমাজে অবহেলিত এই কুৎসিত জীবটি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। সেই সাতসকারে কর্কশ কা-কা-য় ধর না কেন তোমার দিন শুরু, আর দিনাবসানও ওই একই বায়স বাক্যে। এছাড়া সারা দিনের কর্মকাণ্ডে আমাদের সবচেয়ে কাছেও বোধহয় ওই পাখিটিই। দৌরাত্ম্যেও যেমন ওস্তাদ আবার উপকারে তেমন সিদ্ধহস্ত। বাড়িতে এবং বাইরে, লোকালয়ে এবং নির্জনে তুমি কি এক দণ্ড এর অনুপস্থিতি দেখতে পাবে? নো-নো, না না।

কিন্তু এ তো গেল বাহ্যিক জীবনের কথা। বার মহরে বারইয়ার। ভেবে দেখেছ কি অন্দর মহলেও এর ব্যাপক উপস্থিতির কথা? চোখ-কান একটু খোলা রাখলেই বোঝা যাবে আমাদের বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে এই সামাজিক পাখিটি কেমন করে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

কাকভোর শব্দটিই ধর না কেন! হামেশাই তো আমরা এটি ব্যবহার করে থাকি। শব্দটি অতি প্রাক-প্রত্যুষকালকেই সাধারণত সূচিত করে– যে অনতি প্রত্যুষে কাক ভ্রমবশে তার কা-কা রবে দিনের ঘোষণা করে। কিন্তু ভোরে ওঠা স্বভাব যাদের তারা জানে, ভোরে ওঠা পাখিদের একচেটিয়া অভ্যেস। কিন্তু আশ্চর্য, এমন একটি পবিত্রক্ষণে জেগে ওঠার গৌরব পেল

কিনা ওই কাক? জ্যোৎস্না রাতেও অনেকেই হয়তো কাকের ডাক শুনে থাকবে। অল্প জ্যোৎস্নায় দিনভ্রমে কাক ডেকে ওঠে। আমাদের কথাবার্তায় তাই এসে পড়েছে কাক-জ্যোৎস্না কথাটি। কাকের ঘুম ভারি পাতলা। সম্ভবত তার এই অগভীর নিদ্রার কারণেই কাকনিদ্রা কথাটি এসে থাকবে। বলা বাহুল্য কাকতন্দ্রা শব্দটি কাকনিদ্রারই ক্লাসমেট।

পাখির মধ্যে আমরা কাককে গোনায়ই ধরি না। কিন্তু কাক-পক্ষীও টের পাবে না কথাটি দিয়ে যখন আমরা গোপনীয়তা বোঝাই তখন কাকই প্রাধান্য পায় বেশি। এদিকে আবার অন্যান্য জীবের নামের মাঝেও কেমন করে ঢুকে পড়েছে এই পেটুক পাখিটি। কে না জানে সাপের আরেক নাম কাকোদর। কাকপুচ্ছ বা কাকপুষ্ট কোকিলেরই পরিচয়বাহক? আবার পেঁচাকে কাকভীরু বলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে গ্রামাঞ্চলে, কেননা পেঁচার নাকি এত বড় শত্রু দুনিয়ায় আর দুটি নেই। কাকমদগু অর্থে ডাহুক পাখিকেও বোঝায়। কাকক কথাটির অর্থ স্ত্রীজিত পুরুষ, উল্লুক, পেঁচা, নিঃস্ব, নির্ধন উলঙ্গ, বিবস্ত্র ইত্যাদি। ধনে-নির্ধনে অভিধানে একই কাকের প্রতিপত্তি কী ভীষণ। ফলমূলেও এই নামটির অবাধ গতিবিধি। নইলে কাকমর্দ শব্দের অর্থে মহাকাল লতা বা মাকাল বুঝাতে পারত? গাছের ব্যাপারেই দেখ না কেন। নিম গাছের, এমন কি নিম ফলেরও অন্য নামটি কাকফল। কাকতিন্দুক, বোঝাতে বোঝায় মাকড়া গাব। খুদে জাম বা কাকবর্ণ যে জম্বু তাকে কোথাও-কোথাও কাকজম্বুও বলে। কাকরুহা বলতে যেমন পরগাছা বোঝায়, তেমনি আবার কাকমাচিকা বা কাকমাচী বলতে বুঝায় এক ধরনের ক্ষুদ্র বৃক্ষ। শস্য শূন্য ধান আগড়া বোঝাতে কাকযব-এর ব্যবহার অনেকেই জানে। কর্কশ আওয়াজ বা ডাককে আমরা কাকরুত বলেই জানি। স্থল থেকে জলে গিয়েও দেখ কাক আর কাক। স্বচ্ছ নীল জলের টলটলে দীঘির নাম যে কাকচক্ষু দীঘি, সে তো আমরা সাহিত্যেই পাই। আধখামচা স্নানের নাম যে কাকস্নান তা আর কে না জানে! আবার বিধ্বস্ত চেহারার কাউকে আমরা প্রায়ই বলি জড়ো কাকের মতো চেহারা যে!

বলেছিই তো কাক ভারি পেটুক। কিনে খায় না বটে তবে কি না-খায়, তাই-ই বলা দায়। হয়তো লোভ, অতিরিক্ত আগ্রহ ইত্যাদির কারণেই তীর্থের কাক কথাটি এসে থাকবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই পুজো-আর্চায় কাককে সাগ্রহে খাওয়ায়। এতে নাকি পূণ্যসঞ্চয়ের সংস্কার

বর্তমান। কাকের ভোজনার্থে দেওয়া এই খাবারকে বলা হয় কাকবলি। মানুষের শরীরেও উড়ে এসেছে এই কাক। অনেকেই হয়তো জানে না শিখা বা টিকির আর একটি প্রতিশব্দ কাকপদ। অবশ্য অনুরূপ চিহ্ন বোঝাতেও কাকপদ শব্দটির চল আছে। দুই কানের পাশে অল্প ঝোলা চুল বা কানপাটার নাম কাকপক্ষ। একগর্ভা যে নারী (যিনি একবার মাত্র সন্তান প্রসব করেছেন) তাঁকে কাকবন্ধ্যা বলার প্রবণতা কথাবার্তা ছেড়ে সাহিত্যেও পাই। কাকচ্ছদ বা কাকচ্ছদি শব্দটির অর্থ খঞ্জন বা কাকের চদের বা ছদির (আচ্ছাদন) মতো ছদ বা ছদি যার। বাড়বানলবা কাকব্বাজ– যার, তাকে কাকব্বাজ বলার প্রচলন অনেক কালেরই। আর কাক এই শব্দটিরও অন্য অর্থে ব্যবহার আছে। এক কড়ার চার ভাগের এক ভাগকে অঙ্কশাস্ত্রে এক কাক বলে। দেখা যাচ্ছে কাকের মতো আর কেউই নেই যে আমাদের জীবনে এত দিকে এতভাবে মিশে রয়েছে। অতি প্রাচীনকাল থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের এই পাখিটির অত্যধিক সাহচর্য এবং সহযোগিতাই সম্ভবত আমাদের সঙ্গে একে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছে। কৃষি দিয়ে যে-গোষ্ঠীবদ্ধতার সূচনা সেখানেও দেখ আজও কাক-তাড়ুয়ার দোর্দণ্ড প্রতাপ। যদিও এই পুতুলটির ব্যবহার কাকের দৌরাত্ম্যের কথাই ঘোষণা করে, তবু মানুষের সমাজে যাবতীয় পাপ ও নোংরা, ক্লেদ ও বিষ গলাধঃকরণ করতে আর কেউ কি এমন করে এগিয়ে এসেছে?

তবু আমাদের ঠাট্টার শেষ নেই। নইলে 'বেল পাকলে কাকের কী' প্রবচনটি চালু হত? কাকের পেটুক স্বভাবটিই এজন্য দায়ী। আর কাকতালীয়? কার্যকারণ সম্বন্ধহীন দুই ঘটনার সহজ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চালু এই কথাটা কে না জনে! তালগাছের ওপর কাক বসামাত্র তাল পতন– এমন ঘটনা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অলৌকিক। তবুও তো অঘটন আজও ঘটে। নইলে কাকের সঙ্গে এ লেখাটি এটাও কি সম্পূর্ণ কাকতালীয় ব্যাপার নয়?

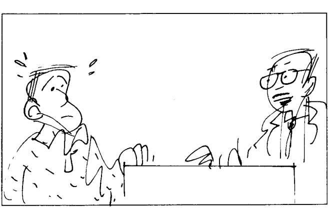

এই ঔষধ আমি কীভাবে পাইলাম

শাহেদ ইকবাল

ইয়াকুব সাহেবের কি একটা কঠিন রোগ হয়েছে। যা দেখেন, তা-ই নিজের বলে মনে হয়। বেশ কয়েকবার ডাক্তার দেখিয়েছেন, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। শেষমেষ এক ডাক্তার জানালেন, 'আপনার সমস্যাটা চোখে। আপনি চোখের ডাক্তার দেখান।'

ইয়াকুব সাহেব আই স্পেশালিস্টের কাছে গেলেন। ভারিক্কি চেহারার আই স্পেশালিস্ট তাকে পরীক্ষা করে-করে বিরক্ত হয়ে গেলেন। লাইট থেরাপি, কালারভিশন– কোনোটাই বাদ গেল না। শেষমেষ তিনিও বললেন, 'আপনার সমস্যা চোকে নয়, মনে। আপনি কোনো মনোবিজ্ঞানীর কাছে যান।'

ইয়াকুব সাহেব গেলেন মনোবিজ্ঞানীর কাছে। বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী কেরামত মওলার সাথে তাঁর নিম্নরূপ কথাবার্তা হল–

'আপনার কী সমস্যা?'

'যা দেখি, তা-ই নিজের বলে মনে হয়।'

'যেমন?'

'পরের গরুকে নিজের গরু, পরের বাড়িকে নিজের বাড়ি, পরের টাকাকে নিজের টাকা, পরের বউকে নিজের বউ'....

'সর্বনাশ!'

ডা. কেরামত মওলা সভয়ে দেখে নিলেন তাঁর নিজের স্ত্রী আশেপাশে

কোথাও আছে কি না। তাঁর কানের পাশে চিকন ঘাম বেরিয়ে এল।

'কখন থেকে শুরু হল এরকম?' তিনি জানতে চাইলেন।

'একদম ছোটবেলা থেকে।'

'কীভাবে প্রথম বুঝলেন?'

'বাবার সাথে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যেতাম, তখন হাতের কাছে যা-ই পেতাম, নিজের মনে করে নিয়ে আসতাম। মসজিদে গেলে অন্যের জুতা পরে বাড়ি ফিরতাম।'

ডা. কেরামত মওলা দ্রুত দেখে নিলেন, তাঁর নিজের জুতা জোড়া যথাস্থানে আছে কি না। তারপর নিশ্চিত হয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

'তারপর?'

'তারপর বয়স যত বাড়তে লাগল, রোগটাও বাড়তে লাগল। প্রথম-প্রথম মনে হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখন আর মনে হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।'

'কী রকম?'

'এখন যা কিছু চোখে পড়ে, তৎক্ষণাৎ নিজের মনে করে নিয়ে আসি।'

'পরের বউকেও?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো অসুবিধা হয় না তাতে?'

'মাঝে-মাঝে হয়। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাও।'

'তারপর?'

'তারপর আবার ছেড়ে দেয়।'

'ছেড়ে দেয় মানে?'

'ছেড়ে দেয় মানে ছেড়ে দেয়। কারণ, পুলিশের মধ্যেও আমার মতো রোগী আছে।'

'হোয়াট?' চমকে উঠলেন ডা. কেরামত মওলা!

'একবার নিউমার্কেট থেকে জনৈক মহিলাকে নিজের স্ত্রী মনে করে বাসায় নিয়ে যাচ্ছি', ডা. কেরামত মওলার প্রশ্ন যেন শুনতেই পান নি এমন ভঙ্গিতে বলে চললেন ইয়াকুব সাহেব। 'লোকজন হাউমাউ শুরু করল। শেষমেষ পুলিশ এসে আমাকে থানায় নিয়ে গেল। সবকিছু শোনার পর ও. সি. সাহেব আমার কানে-কানে বললেন, আপনার যে রোগটা আছে, সে রোগটা আমার আছে। আপনার পকেটে যে টাকাগুলো আছে, সেগুলো

আমার বলে মনে হচ্ছে। কাজেই টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দিন।'

ডা. কেরামত মওলা বজ্রাহতের মতো বসে রইলেন। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনার নিজের স্ত্রী নাই?'

'আছে।'

'তাকে নিজের স্ত্রী বলে মনে হয় না?'

'হয়।'

'সেইসাথে পরের স্ত্রীকেও?'

'জ্বি।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনার রোগটা মানসিক নয়–সামাজিক। আপনি বরং একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাছে যান।'

ইয়াকুব সাহেব ভগ্নহৃদয়ে ডা. কেরামত মওলার চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর যোগাযোগ করলেন ডক্টর শামসুল করীমের সাথে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডীন ডক্টর শামসুল করীম। ইয়াকুব সাহেবের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনে প্রথম যে প্রশ্নটি তিনি করলেন, সেটা হল, 'আপনি কি সমাজকে ভালোবাসেন?'

'জ্বি, বাসি।' নিরাসক্ত গলায় বললেন ইয়াকুব সাহেব।

'কেমন করে বুঝলেন?'

'সমাজের সবকিছুই তো নিজের বলে মনে করি।'

'যেমন?'

'পরের বাড়িকে নিজের বাড়ি, পরের জমিকে নিজের জমি, পরের বউকে নিজের বউ, পরের শালাকে নিজের শালা'...

'থাক, আর বলতে হবে না।' বাধা দিলেন ডক্টর শামসুল করীম। 'আপনার কি মনে হয় না এতে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে?'

'জ্বি না।'

'কেন?'

'আমি তো সমাজ থেকে আলাদা নই। কাজেই আমার উন্নতি মানে সমাজের উন্নতি।'

চেয়ারে হেলান দিলেন ডক্টর শামসুল করিম। চোখ বন্ধ করে কী যেন ভাবলেন। 'আপনার কথাগুলো রাজনৈতিক নেতার মতো শোনাচ্ছে।' বললেন তিনি। 'আমার ধারণা, আপনার সমস্যাটা রাজনৈতিক। আপনি

বরং একজন রাজনৈতিক নেতার সাথে যোগাযোগ করুন।'

ইয়াকুব সাহেব ঢাকার একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সাথে দেখা করলেন। উক্ত নেতা মনোযোগের সাথে তাঁর বিস্তারিত সমস্যার কথা শুনলেন। শুনে প্রথমে তিনি নড়েচড়ে বসলেন, তারপর উঠে দাঁড়ালেন, সবশেষে লাফ দিয়ে এসে ইয়াকুব সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন।

ইয়াকুব সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

'কী ব্যাপার?'

'আপনি আমাদের দলের লোক।' রাজনৈতিক দলের নেতা জানালেন।

'কী রকম?'

'আপনার প্রতিটি বর্ণনা আমাদের দলের মেনিফেস্টোর সাথে মিলে যাচ্ছে।'

'বলেন কি!'

'মেনিফেস্টো দেখতে চান?'

'না, দরকার নেই।'

অতপর ইয়াকুব সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত রাজনৈতিক দলে ঢুকে পড়লেন। এবং রাতারাতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। দলটি একসময় ক্ষমতায়ও গেল।

অতঃপর তাহারা সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

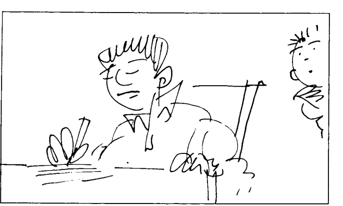

সেভ আওয়ার সোল

সাজ্জাদ কবীর

বছর দুয়েক আগে কাগজ-কলম নিয়ে কিছু-কিছু যুদ্ধ করেছিলাম। তা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের কোনো উপকার না হলেও আমার পাশের দু-এক জন সে-যুদ্ধের গোলায় আহত হয়েছিল। তাই বন্ধু আবু পরামর্শ দিল, "দেখ তোর দ্বারা সাহিত্যটাহিত্য কিছু না হোক আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কথাটা লিখে রাখ অন্তত ভবিষ্যতে নিজেরা পড়ে নিজেদের কথা স্মরণ করে দু'ফোটা চোখের জল ফেলতে পারব।"

অবশ্যই দুর্ভাগ্যটা প্রেম ঘটিত। তবে একটু অন্য রকম আর কি। সেই অন্যরকম ব্যাপারটাই এবার বলছি।

ভাড়ায় যাওয়ার ব্যাপারটা নিশ্চয় সবাই জানেন। যেমন গাড়ি ভাড়ায় যায়, খেলোয়াড়রা ভাড়ায় খেলতে যায়। কিন্তু ভাড়ায় প্রেমের সঙ্গী হওয়ার ব্যাপারটা কেউ জানেন কি না জানি না।

প্রেমিক-প্রেমিকারা হৃদয়-আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলে দেখা করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। বাবা-মাকে লুকিয়েচুরিয়ে দেখা করাটা বেশ সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদেশে যেমন পাহাড়-পর্বত নেই তেমন এই বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা এমন প্রচণ্ড রূপ নিয়েছে যে যেখানে সেখানে দেখা করাও মুশকিল। আর দেখা করা মানে তো শুধু চোখে দেখা না, অনেককিছু। রাস্তাঘাট বা মার্কেট কোনোটাই নিরাপদ না। কারণ জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে প্রেমিক-প্রেমিকাও তেমনি বেড়েছে। অতএব

চেনাশুনো দু-এক জন যে সামনাসামনি পড়ে যাবে না এ কথা হলফ করে বলা যয় না। অতএব হয় শহরের বাইরে অথবা নদীর ধারে।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এত দূর একা-একা অর্থাৎ শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা যেতে সাহস করে না। তাই প্রেমিকের সাথে একজন বন্ধু এবং প্রেমিকার সাথে তার বান্ধবী থাকে। অন্তত প্রথম-প্রথম তাই চলে। তারপর দু' জনেরই সাহস বেড়ে গেলে একা একাই যায়। অবশ্য ওই বন্ধু বা বান্ধবীকে প্রতিদানে সঙ্গ দিতে হয় অন্য সময়। আমাদের কিন্তু কোনো দিনই ভাগ্যে প্রেমের শিকেটা ছেঁড়ে নি অর্থাৎ আমাদের তিন বন্ধুর। তাই উল্লিখিত চুক্তিতে আমরা আবদ্ধ নই।

আমি ব্যক্তিগতভাবে দু'-একবার হাত দেখিয়েছি। প্রেমের রেখাটা নাকি একটু খানির জন্য সাঁ করে খাড়া বাঁক নিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। খাড়া বাঁক সোজা করার উপায় অবশ্য গণক সাহেবের কাছে ছিল। কিন্তু "হাদিয়াটা" একটু বেশি হওয়ায় সেই শিকেটাও হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। অবশ্য আবু আর আমিন হাতটাত দেখিয়েছে কি না জানি না। কারণ আমার হাত দেখানোর কথাটা আমি ওদের কাছে বেমালুম চেপে গেছি।

ব্যাপারটার প্রথম কবে শুরু আমার ঠিকঠাক মনে নেই। আমরা তিনবন্ধু বরাবরই বাজারের একটা চায়ের দোকানে আড্ডা মারি। পকেট সর্বদা সবার ফাঁকা (আমাদের প্রেম না-হওয়ার অবশ্য সেটাও একটা কারণ)। চেনাশোনা কাউকে পেলে 'ছিল্' মেরে দু'-এক কাপ চা, দু'-চারটে স্টার জুটিয়ে ফেলি। আমাদের জন্য বরাবরই অর্ডার যায়, "হায়দার মিঞা দু' কাপ চা, একটা পাইলট।" অর্থাৎ দু' কাপ চা তিন জনে ভাগ করে খাই। অবশ্য সেটুকু সময় আমরা নিজেদের আলাপ বাদ দিয়ে চতুর্থ ব্যক্তিটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি।

নিজেদের আলাপের বিষয় রাজ-আলাপ। রাজনীতি থেকে খেলাধুলো হয়ে প্রেমের (অবশ্যই অন্যের) আলাপ পর্যন্ত। আমিন রাজনীতির উপর জোরালো বক্তব্যটাকে যখন প্রায় রাজ-দরবারে পৌঁছে দিয়েছে তখন রুস্ত মকে দোকানের দরজায় দেখা গেল। তখুনি তিন জন পটিয়েপাটিয়ে দুই-তিন কাপ চা আদায়ের জন্য রাজনীতির জোরালো বক্তব্যকে রাজ-দরবার থেকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে পাক্কা শিকারীর মতো সজাগ হয়ে উঠলাম। রুস্তমকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর ফাঁকে ওর পরিচয়টা জানিয়ে দিই।

প্রথমত আমাদের একজন সৌভাগ্যবান বন্ধু। সৌভাগ্যবান এই জন্য বলছি যে সে একজন প্রেমিক। এবং এটাই তার দ্বিতীয় পরিচয়।

আমার পাশ থেকে আবু বলে ওঠে, "ইয়ে- মানে- রুস্তম তোকে আজ দারুণ স্মার্ট লাগছে।" এটা হল ছিল মারার ইগনিশন চাবি। এরপর এক্সেলেটর দিয়ে একটার পর একটা গীয়ার দিয়ে যেতে হবে। যেগুলো আমরা সবাই একের পর এক দিয়ে যাব। রুস্তম কিছু না-বলে দাঁত বের করে একটা আকর্ণ লম্বিত নিঃশব্দ হাসি দিয়ে এগিয়ে এল।

"তোর লিলির খবর কী? সেদিন দেখলাম নিউমার্কেটে, আগের চেয়ে সুন্দরী হয়েছে কিন্তু।" আমিন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ে। এই এক আশ্চর্য "বালক" (বয়স্ক), কী করে যে আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে লক্ষ্য ভেদ করে আমি ভেবে পাইনে। অবশ্য লিলি নিউমার্কেটে না-গেলেও অসুবিধা নেই, আমিন জানে সেটাকে কীভাবে ম্যানেজ করতে হবে। আমিও চা 'ছিল্' মারার জন্য কথার তীরে ওর চামড়াটা একটু ছিলে দিই, "দোস্ত তোকে আজ লিলি দেখলে না নতুন করে প্রেমে পড়ত।"

আজ কিন্তু রুস্তম অত সহজে পটল না। উল্টো প্রস্তাব দিল একটা। বলল, "তোরা আমার সঙ্গে কলাবাগান (রুস্তমের প্রেমিকা লিলির বাড়ি) যাবি, আমাকে সঙ্গ দিবি, তার বদলে তোদের চা সিঙ্গাড়া।" রুস্তম আবার যোগ করে, "যাওয়া-আসার ভাড়া অবশ্য আমিই দেব।" আমরা প্রথম ভড়কে যাই। এ আবার কী ধরনের কথাবার্তা। এ তো দেখি পাক্কা ব্যবসায়ীদের বোলচাল। কিন্তু তখন আমাদের চায়ের তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে! তাই আমরা প্রস্তাবটা লুফে নিলাম।

সেই থেকেই শুরু। রুস্তমের সাথে যাওয়ার কথা আকবর জানল। অতএব আকবরকেও সঙ্গ দিতে হল। তারপর আকবর থেকে সবুজ, তা থেকে মশিউর তারপর আযম এবং আরও অনেকে। বিনিময়ে হয় চা, সিঙ্গাড়া, স্টার আর কপাল খুললে চা, মিষ্টি, গোল্ডলিফ। এটা নির্ভর করে দেখা হওয়ার গ্রেড অনুযায়ী। যেমন শুধু প্রেমিকার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এলে চা, সিঙ্গাড়া, স্টার। সিনেমা হলে দেখা হলে মিষ্টি, চা আর দোতলা সিগারেট। দূরে কোথাও অর্থাৎ শহরের বাইরে কোথাও গেলে ভারী খাওয়াদাওয়া। কাজটা সামান্যই। সঙ্গে যেতে হবে। একবার এমাথা থেকে ওমাথা, আবার ওমাথা থেকে এমাথা। সাথে-সাথে প্রেমিকার রূপের (মা-কালী হলেও) আর গুণের প্রশংসা করা। কিংবা পার্কে এলে দূরে বসে

পাহারা দেওয়া। আর সতৃষ্ণ নয়নে মাঝে মধ্যে চেয়ে দেখা। প্রধানত দলে ভারী রাখা, যাতে অন্য কোনো খলনায়ক (গব্বার সিং জাতীয়) এসে ঝামেলা না বাধায়। অবশ্য তেমন কোনো ঝামেলা হলে আমাদের তিন জনের দৌড় প্রতিযোগিতাটা দেখার মতো হত।

অন্যরা সবাই যেহেতু নিজের-নিজের প্রেমিকা নিয়ে ব্যস্ত সেহেতু আমাদের ব্যবসা রমরমা। তা ছাড়া বন্ধুর প্রেমিকার সাথে দু-চারটে মিষ্টি বাক্যালাপ করে এত আনন্দ পেয়েছি যে নিজেদের প্রেমের সাধকে রসগোল্লার মতো টপ করে গিলে ফেলেছি। তবুও নাকি আমিন একবার লাক ট্রাই করেছিল। একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল যেন কীভাবে। একদিন পার্কে যাওয়ারও প্রস্তাব দিল। আমি, আবু বিনা ভাড়ার সঙ্গী। কারণ এটা নিজেদের ব্যাপার।

তিন জন বাসে করে পার্কে গিয়ে হাজির হলাম। মেয়েটিও এল রিকশায় করে কিছুক্ষণ পর। আমিন ঠিক করে রেখেছিল খাওয়াদাওয়ার ধার দিয়ে যাবে না। তিন জনের পকেটে বাস-ভাড়া দেওয়ার পর আছে সাকুল্যে আড়াই টাকা। আমিন আর মেয়েটাকে এক জায়গায় বসিয়ে আমি আর আবু একটু দূরে বসে গল্প করতে লাগলাম। একটা মুড়িওয়ালা আমিনদের ওখানে ঘুরঘুর করছিল। আমিন বলে বসল, "মুড়ি খাবে?" মেয়েটি অঙ্গভঙ্গি করে বলল, "না খেতে ইচ্ছা করছে না।" যাক বাবা বাঁচা গেল। যদিও দুটো টাকা দেওয়া যেত কিন্তু তা হলে হেঁটে যেতে হত। কিছুক্ষণ পর এক কোল্ডড্রিঙ্কসওয়ালা উৎপাত শুরু করল। আমিন তখন বুঝে গেছে মেয়েটি কিছু খাবে না। তাই আবার বলে ফেলল, "কোল্ডড্রিঙ্কস খাও।" মেয়েটি সেইভাবে আবার নাকচ করে দিল। আমিন তখন নিশ্চিত যে খাবে না তাই আবার বলল, "খাও না।" মেয়েটি বলল, "ঠিক আছে এত করে বলছেন যখন তখন নেন।" কোল্ডড্রিঙ্কসওয়ালা আর দেরি করল না, পটাপট মুখ খুলে ফেলল দুটোর। ওহ! বোতলের মুখ খুলল না তো যেন আমাদের মাথার খুলি খুলে ফেলল। আমাদের দিকে মেয়েটি আঙুল দেখিয়ে বলল "ওনারা?" আমরা দু'জন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "না না আমরা খাব না।" আবু বলল, "আমার গলায় ব্যথা।" আমি কী বলি খুঁজে না পেয়ে বললাম, "আমার মাথাব্যথা"। "মাথাব্যতা হলে কোল্ডড্রিঙ্কস খেতে অসুবিধা কী?" মেয়েটি বলল। মহা ফ্যাসাদ কী করি? তাড়াতাড়ি বললাম, না মানে মাথা ধরেছে, মানে সর্দির জন্য।" টাকা দেওয়ার সময়

আমিন পকেটে হাত দিয়ে বলল, "যা! আমার পকেটমার হয়ে গেছে, তোরা দিয়ে দে তো।" কেমন নচ্ছাড় আমাদেরকে কিনা এভাবে ফাঁসিয়ে দিল। আমাদের গাঁইগুঁই করতে দেখে মেয়েটি বলল, "ঠিক আছে আমিই দিয়ে দিচ্ছি।" কোল্ডড্রিঙ্কসওয়ালাটা এমন পাজী হলুদ দু' পাটি দাঁত বের করে বলে কি, "স্যার আপনেগরেও কি পকেট মাইর হইছে।" ইচ্ছে হচ্ছিল ওর বোতল দিয়েই ওকে বোতলপেটা করি। মেয়েটির কাছেও বোধহয় বেশি টাকা ছিল না। যাওয়ার সময় দেখলাম বাসে করে গেল। এবং সেই শেষ আর কোনো দিন আমিনের সাথে যোগাযোগ করে নি।

কিন্তু যাক সে কাহিনী। ক'দিনের মধ্যেই আমদের স্যাণ্ডেলের এমন অবস্থা হল যে দেখলে মনে হবে তিন জনই একই সাথে চার-পাঁচটা প্রেম করছি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র পরের প্রেমের ডিউটি দিতে গিয়েই স্যাণ্ডেলের সোলগুলার ভোল পাল্টে গেল। তা ছাড়া আজ বেশ কিছুদিন যাবৎ হাঁটুতে কেমন ব্যথা করছে। মনে হচ্ছে যেন গেঁটো বাত হয়েছে। আবুকে সে-কথা বলায় জানাল, তারও নাকি মাজায় চিনচিনে ব্যথা হয়েছে। আর আমিনের তো বুক ধড়ফড়ানি রোগ হয়েছে। একটুতেই নাকি শ্বাস কষ্ট হয়।

তা হবেই বা না কেন, সকালে ন'টায় সবুজের জন্য গার্লস স্কুলের সামনে, বেলা বারটায় আকবরের জন্য পার্কে, সাড়ে চারটেয় মশিউরের জন্য নদীর পাড়ে। এমনি করে রুস্তম, কামাল, হাদি আরও অনেকে।

সামান্য চা-সিঙ্গাড়ার জন্য এত ধকল আর সহ্য হয় না। বিনা প্রেমেই হৃদয়ের রোগ হয়ে গেল। অবশ্য নিজের না-হলেও অন্যের হচ্ছে। এক বন্ধুর জন্য করলে অন্য বন্ধুর জন্যও করতে হবে। না-চাইলেও উপায় নেই। ইদানিং লক্ষ করছি আমাদের 'সোল'গুলোও স্যাণ্ডেলের সোলের সাথে 'সেভ আওয়ার সোল' বলে চিৎকার জুড়েছে।

নাম নিয়ে নাকাল

আসরার মাসুদ

নাম শব্দের আভিধানিক অর্থ কিন্তু অনেকগুলো। আখ্যা, খ্যাতি, শপথ, সংজ্ঞা, পরিচয়, উল্লেখ, স্মরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সব মিলিয়ে গোটা বিশেক তো হবেই। তা যে শব্দটার অর্থটাই আছে বিশ রকমের তাকে নিয়ে যে পদে পদেই অনর্থ হবে এ তো জানা কথা। এই লেখায় নাম নিয়ে যত ধরনের নাকাল হবার সম্ভাবনা আছে তার মধ্যে থেকে কয়েকটা উল্লেখ করতে চেষ্টা করব।

প্রথমে আসা যাক নাম রাখার প্রসঙ্গে। মুসলমান মাত্রই দেখা যায় আরবি শব্দের মিশ্রণে নাম রাখতে (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে)। তো এই ইসলামী নাম রাখতে গিয়ে কী বিপত্তি তাই নিয়ে একটা সত্যি ঘটনার উল্লেখ করি। সম্ভবত ছিয়াশি সালের ঘটনা (ইতিহাসে ছেচল্লিশের বেশি পাওয়ার রেকর্ড লেখকের নেই বিধায় সন তারিখ সঠিক হবার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা ৪৬%)। হজ্বে যাবার জন্য ঢাকারই একটা পরিবার প্রস্তুত হল। খানদানি মুসলিম পরিবার। কাজেই এটা তো বোধহয় বলার অপেক্ষা নেই যে সবার নামই ইসলামী নিয়মে রাখা। কর্তার নাম আবু তাহের, কর্ত্রী উম্মে কুলসুম, মেয়ের নাম সাহারা বিনতে তাহেরা আর দুই ছেলে ইবনে জামান ও ইবনে কামাল। বেশ ভালোমতোই তারা সবকিছু ঠিক করে পাড়ি জমাল সৌদি আরবের পথে। নো ঝামেলা, নো হাঙ্কিপাঙ্কি। চোরাই ডলার পর্যন্ত নেই। তবু সৌদি আরবে নামতেই লেগে গেল মহা গ্যাঞ্জাম; আর সব

গ্যাঞ্জামের মূলেই আছে নাম। কী ব্যাপার? সৌদি পুলিশ সবাইকে আটক করেছে ভূয়া পরিচয় দেবার জন্য। আবুতাহের অর্থ নাকি তাহেরের পিতা, সেটা মানতে তাদের আপত্তি ছিল না কিন্তু তাহের নামে তাহের সাহেবের কোনো ছেলে না থাকাতেই যত গোল। একই কেস উম্মে কুলসুমের ক্ষেত্রেও। নাম উম্মে কুলসুম হতেই পারে কিন্তু তার জন্য নাকি মহিলার কুলসুম নামের একটা মেয়ে থাকতে হবে। সাহারা বিনতে তাহেরা আটকে গেল সাহারা কেন তাহেরার মেয়ে না বলে। আর ইবনে জামান ও ইবনে কামালকে নিয়ে তো রীতিমতো টানা-হ্যাঁচড়া পড়ে যায়। আপন দুই ভাই কী করে একজন জামান ও একজন কামালের ছেলে হতে পারে সৌদি পুলিশের মাথায় কিছুতেই ঢুকছিল না। এক ব্যাটা গবেট নাকি তখন এমনও বলেছিল যে ওদেশে মেয়েরাও বোধহয় চারটা বিয়ে করে থাকে। তা শেষ পর্যন্ত তাহের সাহেব যে কী প্রক্রিয়ায় এই হাঙ্গামা থেকে ছাড়া পেয়েছিল সেটুকু জানার সুযোগ আমার হয় নি।

এ প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটা নামের কথা বলে নিই। নামটা মেয়েদের। আন্না কালি। এই নামটা রাখার পিছনের কারণটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক। যখন কোনো হিন্দু দম্পতির ক্রমাগত মেয়ে হতে থাকে তখন তারা দেবী কালির কাছে আর যাতে কন্যা সন্তান না জন্মে সেই প্রার্থনা জানিয়ে নবজাত মেয়ের এই নাম রাখে আন্না কালী অর্থাৎ আর না কালী।

নাম রাখার ব্যাপারটা তো মোটামুটি বলা গেল। এবার নাম ভোলার একটা ঘটনা বলি। সেদিন দুপুরে শাহবাগে দাঁড়িয়ে রিকশা খুঁজছিলাম বাসায় আসার জন্য হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক একটা গাড়িতে উঠতে গিয়েও আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর প্রায় ছুটতে-ছুটতে আমার কাছে এসে বললেন, 'আরে শালা। মাসুদ না? তুই তো দেখি শালা পিপের মতো মোটা হয়েছিস।' তাকিয়ে দেখলাম অতি পরিচিত একটা মুখ কিন্তু নামটা যে কী? শামীম? না না শামীম তো সেই ফর্সা ছেলেটা। তবে কি রুহুল? না না রুহুল হবে কেন, রুহুলের তো ডান কানটা বামটার চেয়ে দেড় গুণবড় (মাস্টারদের তীব আকর্ষণেই এমনটা হয়েছিল)। ওদিকে ভদ্রলোকের পাশে ততক্ষণে একজন তরুণীও এসে দাঁড়িয়েছে। উনি বললেন, 'দোস্ত বুঝতেই পারছিস এ হল...।

বেশ বুঝলাম। কিন্তু গ্যাড়টা তো অন্য জায়গায়। নামটা তো ছাতার মনেই আসছে না। আচ্ছা ওয়াহিদ না তো? নাহ, তা হবে কেন, দুই

ওয়াহিদের চেহারাই তো মনে আছে। ভুঁড়ি ওয়াহিদের ছিল খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দমের মতো চেহারা আর পিলে রুগীর মতো বিশাল একটা ভূঁড়ি। আর ঢ্যাব্যা ওয়াহিদ তো ছিল পুরোটাই কোলাব্যাঙের মতো। তা হলে এই দুই ওয়াহিদের মধ্যে একজনও না। তবে কি কুদ্দুস? ওদিকে মহিলা তখন শুরু করেছেন, 'বুঝলেন মাসুদ ভাই ও দিনের মধ্যে অন্তত দশবার আপনার গল্প বলে। ছোটবেলায় আপনারা কেমন করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা একসাথে ঘুরতেন, স্কুলে কী করতেন...।'

যাক বাবা একটা ক্লু পাওয়া গেল। এই সম্বন্ধীটা তা হলে আমার পিচ্চি কালের দোস্তো। ফের হাতড়াতে থাকি, ওবায়দুল কি? না ওবায়দুলের তো ঠোঁটের নিচে বিরাট একটা তিল ছিল। তা হলে নির্ঘাৎ সাইদুর হবে। হাঁ, সাইদুরই বটে। মোটামুটি যখন স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে এটা সাইদুর ছাড়া অন্য কেউ না তখন মেয়েটা বলে, 'মাসুদ ভাই, একবার যখন আপনাকে সামনাসামনি পেয়ে গেলাম তখন আর ছাড়াছাড়ি নেই। চলেন, বাসায় চলেন। আজ আপনি আমাদের জিম্মি।' ভদ্রলোক তখন আমার পিঠে বিশাল এক থাবা বসিয়ে বললেন, 'কিরে শালা ফলুই মাছের মতো অমন ফ্যালফ্যাল করে কী দেখছিস? ওঠ... গাড়িতে ওঠ...।'

বলে ওরা গাড়ির দিকে এগোতে থাকে। এমন সময় আমার চোখে পড়ল ওর হাতে একটা ফাইল, তার ওপর গোটা করে লেখা নাজমুল আহসান, গ্রন্থাগারিক, আবদুর রহমান স্মৃতি পাঠাগার। আগরহাটি, যশোহর। আরে যাহ এ তো দেখি নাজমুল। হাঃ হাঃ হাঃ আমি আসলে একটা ছাগল। এতক্ষণ এই সোজা জিনিসটা আমার চোখেই পড়ে নি। এ তা হলে আমাদের নাজমুল। হ্যাঁ, এই তো বেশ মিলে যাচ্ছে সেই চোখ সেই এক হাত পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা, দাঁড়ানো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এ আর কেউ না নাজমুলই। ইস্, ভাগ্যিস সাইদুর বলে ডেকে উঠি নি। দরজা খুলতে-খুলতে নাজমুল বলল, 'চল শালা আগে বাড়ি চল...।'

আমি বেশ চিন্তিত মনেই বললাম, 'নারে নাজমুল আজ না। তোর ঠিকানাটা বরং দিয়ে যা...।'

এটুকু বলতেই দেখি নাজমুল আর তার বৌ-এর চোখ পুরো ছানাবড়া হয়ে গেছে। দু'জন প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, 'নাজমুল?'

তারপর নিজের হাতের ফাইলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা আমার ফাইল না। নাজমুলের একটা কাজ ছিল পাবলিক লাইব্রেরিতে...।'

ওর বৌ ততক্ষণে গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে। এবার গলা বের করে বলল, 'চল রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আর ফালতু বকবক করতে হবে না।

ভদ্রলোক আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'সরি আমার নাম সাইদুর।'

তারপর হুশ করে একরাশ কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে গাড়িটা চলে গেল। আমি বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

মানুষ যখন খুব বেশি রেগে যায় তখনও কিন্তু নাম নিয়ে ঝামেলা বাধে। কেউ-কেউ তো বলে বসে, 'ওর নাম আমার সামনে বলবে না'। এবার নাম মুখে না-আনা বিষয়ে একটা ছোট্ট ঘটনা বলে লেখাটার ইতি টানব।

আমার গ্রামের বাড়ির পাশের গ্রাম কাশিপুরের ঘটনা। এখানে হামিদ আর হায়দার নামে দুই ভাই আছে। অবস্থা খুব বেশি ভালো না। সরকারি ভাষায় বলা যায় ক্ষুদ্র চাষী। জমি যেহেতু অল্প তাই দু' জনে চাষবাস একসথেই করে থাকে। তো একদিন কী কারণে দু' জনের মধ্যে মহা ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার সমাপনী সিদ্ধান্ত ছিল ওর নামটা পর্যন্ত আমি আর মুখে আনব না। পরদিন সকালে ছোটভাই হায়দারের জমিতে চাষ দিতে যাবার কথা। এখন যতই ঝগড়া হোক আর যাই হোক না কেন বড়ভাইকে জিজ্ঞেস না করে নিজে থেকে ইচ্ছামতো একটা জমি তো চষতে পারে না। অথচ ভাই-এর নামও নিতে চাচ্ছে না। তাই বুদ্ধি করে গোয়াল থেকে গরু বের করে গলা উঁচু করে বড়ভাইকে শুনিয়ে-শুনিয়ে গরুর পিঠে বাড়ি দিয়ে বলে, 'এ্যাই গরু, আজ তালি কোন দিকের জমি চষতি হবি য্যান (যেন গরুকেই বলছে)?

বড়ভাই, নিজের জেদ ধরে রেখেই গলা তুলে বলে, 'ও গরু যা, আজ তালতলার জমিটা চইষে আয়গে, যা।'

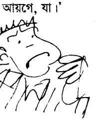

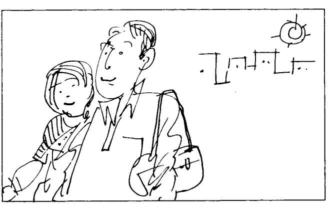

ভ্রমণেচ্ছুঃ গমনং সাবধানং

এনামুল করিম নির্ঝর

আপনি কি সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক অথবা পাঠিকা? তাহা হইলে যদি প্রশ্ন করি, কোন সেই সংবাদ যাহা সম্প্রতি প্রতিদিনই সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উপরাংশে ঠাঁই পায়। জানি, একটু ভাবিয়াই উত্তরে বলিবেন– দুর্ঘটনার সংবাদ। আসলে ইহা বর্তমানে আহার গ্রহণের মতোই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে (অনেকের মতে ইহার পশ্চাতে নাকি 'হ্যালী' প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিতেছে)। তবে আমার আজিকার এই ঘটনাকে ওই সকল সংবাদের কাতারে ঠেলিয়া দেওয়া ঠিক হইবে না।

এই হতভাগ্য নিজ বিবি সহকারে পিতামাতার সহিত একত্রে ঈদ করিবার উদ্দেশ্যে মফস্বল শহরে নিজস্ব বাটিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু হায়...!

তাহা হইলে খুলিয়াই বলি।

যথারীতি ঈদের প্রায় দশ-পনের দিন পূর্বে টিকিট কাটতে গেলাম। বিশাল লাইনের পুচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াও অবশেষে ধস্তাধস্তির শিকার হইতে হইল। না হতভাগ্য কিছুই করে নাই। ফুটবলের মাঠে একটি ফুটবলের যাহা ভূমিকা উহারও তাহাই ছিল। তথাপি প্রচণ্ড গরমে লেপ্টাইয়া লাইন আকড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে এক সময় কাউন্টারের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আমার সম্মুখে যখন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি তখন দেখি দেওয়ালের উপর লেখা সাবধান বাণী : 'পকেট সাবধান'। তৎক্ষণাৎ

পকেটে হাত চালাইলাম এবং বেকুব বনিলাম। সত্যসত্যই মানিব্যাগ খোয়াইয়া শুষ্ক বদনে বাটিতে ফিরিয়া আসিলাম। তবুও ভাগ্য সুপ্রসন্ন দুই-তিন দিবস এইরূপ যুদ্ধ করিবার পর কালোবাজারে একখানি এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিট মিলিল। হাতে তখন মাত্র একটি দিন। তথাপি মনে হইল যেন স্বর্গ হাতে পাইয়াছি।

নির্দিষ্ট দিবসে টিকেটে লেখা সময়ানুযায়ী আরো এক ঘণ্টা পূর্বেই স্টেশনে রওয়ানা হইলাম। স্টেশনে গিয়া দেখি ট্রেন ছাড়িবে সাড়ে আটটায়। কিন্তু টিকিটে লেখা সাড়ে সাতটায়। হতবাক হইয়া রেলওয়ের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। উনি স্মিত হাসিয়া কহিলেন, ভুল করিয়া আপনার টিকিটে সংশোধন করা হয় নাই। হায়রে নিয়তি! শুরুতেই বিপত্তি!

যাহা হউক দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর ট্রেন মহাশয় ছাড়িলেন। কিন্তু ছাড়িয়াও যেন ছাড়িতে পারিলেন না। তাহার গতি বারংবার হিক্কা তুলিতে লাগিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমি তখন প্রায় ক্লান্ত। ক্রমশ ঝাকুনী এবং দুলুনী খাইয়া খানিকটা আরামপ্রাপ্ত হইতেই গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হইলাম।

কিন্তু না, খানিকক্ষণ পরই ঘুম ভাঙিল। ট্রেন তখন স্থির। জানালা দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখি দুই পার্শ্বে জঙ্গল। ভাবিলাম, নিশ্চিত ডাকাত পড়িয়াছে। বিবি আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া কহিল, জান, ইহা রাজেন্দ্রপুর। নাম শোন নাই?

কহিলাম, জানি না, এই পথে এই প্রথম যাতায়াত করিতেছি। কিন্তু ট্রেন থামিবার কারণ কী?

বিবি আবার হাসিল, কি জানি, স্প্রীং ভাঙিয়া আগুন ধরিয়া গিয়াছে। দুইটি বগী নাকি রাখিয়া যাইতে হইবে।

মনে-মনে বলিলাম, হায় খোদা সকলই তোমার ইচ্ছা।

ওদিকে বিপুল পরিমাণে যাত্রী ট্রেনের টয়লেট ব্যবহারের এই সুযোগ পাইয়াই প্রয়োজন সারিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল চুপচাপ থাকিয়া বিবি সহকারে ডাইনিং কারে উপস্থিত হইলাম (বলাবাহুল্য পেটের পীড়া জনিত কারণে রোজা রাখা হয় নাই)। গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র, ট্রেনখানি আবার দুলিয়া উঠিল এবং চলিতে লাগিল। চারিপাশে রোল উঠিল, এই বগী রাখিয়া যাইবে। সকলেই

নিজ-নিজ বগীতে ছুটিল। এবং এই সুযোগে ম্যানেজার সাহেব আংশিক আহারের দায়ে বড়সড় ছিল মারিতে লাগিল।

কেহই পড়িয়া থাকিল না। ট্রেন ধীর বেগে সম্মুখে আগাইল। শুনিলাম পরবর্তী স্টেশনে ট্রেনের দৈর্ঘ্য ছোট হইবে। পরের স্টেশনে পৌছিতে না-পৌছিতে অধিকাংশ যাত্রীর বত্রিশখানা দন্ত বিকশিত হইয়া গেল। কারণ স্টেশনের নাম ইজ্জতপুর! এক ভদ্রলোক বলিলেন, ইজ্জতপুর আজিকে বেইজ্জত করিয়া ছাড়িবে।

অতঃপর পাঁচ-ছয় ঘণ্টা প্রতীক্ষার পর ট্রেন খানিকটা সুস্থ হইল (দুই একটি বগীতে পূর্বেই ক্রস মার্ক দেওয়া ছিল) এবং ছাড়িল। কিছুকাল ভালোই অগ্রসর হইল। কিন্তু পুনরায় বিপত্তি। একটি স্টেশনে ট্রেন থামিবার কথা নহে। কিন্তু বহু সংখ্যক লোকজন লাইনের উপর অবস্থান লইয়াছে এই দাবিতে যে তাহাদের ট্রেনে উঠাতেই হইবে। দাবিতে অটল থাকিয়া তাহারা বারবার স্লোগান তুলিতে লাগিল। বুঝিলাম নিস্পত্তি হইতে সময় লাগিবে। কর্তৃপক্ষ উপায়হীন হইয়া ইটের ভয়ে জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। ইহা তো হইল বাহিরের অবস্থা, কিন্তু অভ্যন্তরের?

ওই ফেলিয়া যাওয়া বগীতে ছিল একটি তবলীগ পার্টি। উহারা নিজ-নিজ আসন হারাইয়া সদলবলে ক্ষীপ্ত হইয়া আমাদের কম্পার্টমেন্টে হামলা চালাইল। প্রথমত, 'আল্লাহ যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করেন' এই বাণী শুনাইয়া তাহাদের ঈষৎ ঠাণ্ডা করা হইল। তাহারা দাবী জানাইল, সীটে তাহাদের ভাগ দিতে হইবে। এদিকে ওই ভদ্ররোক (যিনি বেইজ্জত হইবার ভয় করিয়াছিলেন) তাহার বিবিকে বসাইয়া একটু সরিয়াছেন। আর যায় কোথায়! তবলীগ দলের একজন টপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন ফাঁকা স্থানে। ভদ্রলোক ফিরিয়া তো বেকুব। এই ঘটনায় সকলেই ক্ষুদ্ধ হইলে উহারা আপাতত নিশ্চুপ হইল।

এইরূপ নানা ফাঁড়া ডিঙ্গাইতে প্রচুর সময় বহিয়া গেল। আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হইলাম যে ট্রেনেই আমাদের ঈদ সারিতে হইবে। ৮ জুন সন্ধ্যা। যাত্রীরা সকলেই কমবেশি উৎকণ্ঠিত। পরদিন ঈদ। কেহ-কেহ আবার জানালা দিয়াই চাঁদ খুঁজিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরই খবর আসিল চাঁদ আমাদের পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। সেই সাথে চাঁদ দেখা কমিটি। ঈদ ৯ তারিখে না হইয়া হইবে ১০ তারিখে। আনন্দে আমাদের অন্তর নর্তন কুর্দন আরম্ভ করিল। আমি তবুও ভাবিলাম, পৌছিতে পারিব তো?

অবশেষে যখন গন্তব্যে পৌঁছিলাম তখন ১০ জুন সকাল সাড়ে সাতটা। ওই মফস্বল শহরটি সম্প্রতি মেট্রোপলিটান শহর (কী গুণে হইয়াছে জানি না) হিসাবে ঘোষিত হইলেও সমগ্র রাস্তাই গভীর চর্মরোগে আক্রান্ত। রিকশায় উঠিলেই নাচিতে হয়। এইরূপ নাচিতে-নাচিতে বিবি সহকারে বাটির কাছাকাছি ঈদগাহে উপস্থিত হইলাম। তখন নামাজ প্রায় শেষ। সকলে মোনাজাতে বসিয়াছে। আমি ছুটিয়া গেলাম। তবু শেষ রক্ষা হইল না। আমি বসিবার পূর্বেই ইমাম সাহেব দোয়া শেষ করিলেন।

বাটিতে পৌঁছিবামাত্র মাত্র হাউমাউ কান্না শুরু করিলেন। এই কান্না আনন্দ ও দুঃখ মিশ্রিত। আমি তাঁহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া বার দুই-তিন কান ধরিয়া উঠাবসা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর প্রাণ থাকিতে ট্রেনে উঠিব না।

কিন্তু তাহার পর? প্রত্যাবর্তনকালে ট্রেন বাদ দিয়া বাসে উঠিলাম। ইহার কাহিনী আরও করুণ। ওই ধকলের বদৌলতে যে পরিমাণ ক্লান্ত হইয়াছি তাহাতে উহার বর্ণনা অসম্ভব (যেন কাহারও যাত্রাজনিত ভীতিতে যাত্রাতঙ্ক না হয়)।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, ইহাকে কী বলিব? দুর্ঘটনা? না ভাগ্যের বিড়ম্বনা? নাকি ওই হ্যালী ব্যাটাই সকল কিছুর পশ্চাতে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিতেছে?

বেচারাম ডিম বেচে, কেনা...

ফাকিহা হক

'প্রয়াস'-এর জন্য একটা লেখার অপপ্রয়াস চালাচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই বন্ধু এল।

'শিবরামকে ভালোই আত্মস্থ করেছ', বন্ধু বলল।

'তার মানে?' চমকে যাই আমি।

'মানে হৃদয়ঙ্গম আর কি। ওর ছায়াতেই তো তোমার বসবাস।' সে জানায়।

আমি মওলানা মওদুদী বা আদভানীর মতো কট্টর মৌলবাদী নই তবুও বেজাতের একজন পরপুরুষকে হৃদয়ে ধরেছ এমন অপবাদে প্রায় আতঙ্কিতই হলাম। বিস্ফারিত চোখে তাকাতে সে বলল, 'আরে শিবরাম, শিবরাম চক্রবর্তী লেখক।'

'ওহ, তাই বল।' ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার। তবু একজন ব্যাচেলারের সাথে (তিনিস্বর্গবাসী হলেনই বা!) এমন হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক স্থাপন আমার পছন্দ হলনা। যতই বয়সের পার্থক্য থাক তবুও এসব ঠাট্টা ইয়ার্কি থেকে অনেক সিরিয়াস ব্যাপার ঘটে। রামের ব্যাপার যখন তখন সীতার মতো আমার আবার আগুনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হতে পারে। আমি ইব্রাহীম নবীও না, দমকল বাহিনীর লোকও নই। না, বাবা, ও আমার কম্ম নয়। আগুনে আমার ভারি ভয়। তার গুণ যতই থাক, 'খাই খাই' করে ছাই করার দোষটাও কম নয়। আগুনে হাঁটতে বললে আমি সোজা সুন্দরবন বা

আফ্রিকার জঙ্গল নয়ত কেওক্রাডাং বা তিব্বত চলে যাব। নূরজাহানের অগ্নি পরীক্ষায়, সমাজপতি বা পাতি কাঠমোল্লার আগুনের কাঠ হবার চেয়ে ইয়েতি বা হাতির মতো সভ্য প্রাণীর সাথে থাকা সহজতর। ফেনিয়ে ব্যাখ্যাসহ জানাই বন্ধুকে, 'ঠিক আছে, এস তা হলে প্রসঙ্গ পাল্টে আরেক রাম,তোমার পছন্দের বেচারামকে অর্থাৎ শপিংকে নিয়ে গ্যাঁজাই।'

তা ঠিক প্রায় তাবৎ মেয়েদের পছন্দের টপিক বা টনিক– শপিং, ১০৩ ডিগ্রি জ্বরও হটিয়ে দিব্যি চাঙ্গা করে তোলে। সেই বিষয় নিয়ে যে গল্প তা নিয়েই আজ ব্যাখানা।

কিন্তু এ ব্যাপারটিতেও আমি অন্যসব ব্যাপারের মতোই আনাড়ি, বিক্রেতাকে ধরাশায়ী করার নাড়ী-নক্ষত্র বুঝি না। আমাকে সিদ্ধহস্ত বলা যাবে না কিছুতেই। সিদ্ধ কি দাম যা আগুন তাতে কয়লা-পোড়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাও তো কবিতার কেনারাম কাকপক্ষীই পেয়েছিল, কিন্তু এই কেনা সীতাকে ওরা ডাইনোসরের ডিমও গছাতে পারে। আসলে নিজের সম্বন্ধে এতটা খারাপ ধারণা ছিল না। ধারণাটা ধরিয়ে দিল ঝর্ণা। ও যে শাড়িটা ৩০০ টাকায় কিনেছিল, অবিকল সেই রকম একটা 'বেলা তিনটার সময় বইন করছি, একেবারে কেনা দামে দিয়ে দিলাম, কিচ্ছু লাভ হল না আপা' ইত্যাদি কানের কাছে কচকচিসহ দোকানী নয় শ' সাতানব্বই টাকায় দিয়ে দিল। ঝর্ণাকে দেখাতেই সে আহ্লাদে আটখানা। ওর হাসি আমাকে আরও বিষণ্ন করে ফেলল। বললাম, 'আমাকে যে এত বোকা দেখায় ভাবি নি।'

আরেক পাট হেসে নিয়ে ঝর্ণা বলল, 'সে বিষয়ে সন্দেহ আছে?'

বিমর্ষতর হয়ে বললাম, 'খুব একটা ছিল না। এখন একেবারে কনফার্মড হয়ে গেলাম।' আমি যে দরদাম করতে পারি না ঠিক তা নয়। সত্যি বলতে কি বিক্রেতার দামের এক পঞ্চমাংস বলার জন্য যে সাহসের দরকার আমার সেটা নেই। কেন? বলছি।

আমার প্রতিবেশীর ছেলে গোস্তের দাম কমিয়ে বলাতে কসাই পঁচা মাংসও দেয় নি। সোজা বলেছিল, 'ডাল কিনে নিয়ে যাও খোকা।' এই ভয়টাই কাজ করে। শেষে যদি বলে, 'শাড়ি বাদ দেন আপা একখান রুমাল কিনে নিয়ে যান।' কিন্তু রুমাল কি আমার গোড়ালী অব্দি শাড়ির পরিপূরক হতে পারবে? আমি ঠিক ততখানি লম্বায় ছোটও না। তা ছাড়া দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আছে না?

আর বিক্রেতাদের সাথে বেশি কথা বলাও মুশকিল। একদা এক বিপজ্জনক মুহূর্তে মিসেস সাত্তার বিক্রেতাকে বলে বসেছিলেন, 'এত দাম হতে পারে? আপনি পাগল?'

আর যাবে কোথায়? মুহূর্তে সামান্য মুদ্রাদোষ শেয়ার মার্কেটের অকস্মাৎ ডলারের দাম কমে যাবার মতো অঘটন ঘটাল্

দোকানি প্রায় পাগল হয়ে বলল, 'আপনি জিনিস নেবেন না, নেবেন না, কিন্তু আমাকে পাগল বলবেন কেন?' সে এক তুলকালাম কাণ্ড। অবশ্য মিসেস সাত্তারের ধারণা ও ব্যাটা নির্ঘাৎ পাবনায় ছিল, সিক্রেট বেরিয়ে পড়ায় অমন মারমুখী।

আমাদের দেশের বিক্রেতারা যখন কিছু বিক্রি করেন তখন তাঁরা বর্তমানটাই দেখেন শুধু। এটা যে কেউ ক্যাশ মেমোর দিকে তাকালেই বুঝবেন। এর নিচের দিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে লেখা, 'বিক্রিত দ্রব্য ফেরত লওয়া হয় না।' অর্থাৎ একবার গছাতে পারলেই হল। ক্রেতাকে সাত তলা সমান গাছে তুলে মই কেড়ে নেবার দশা। ঠিক যেন 'কেমন ঠকালাম'-এর কৃতিত্ব। অথচ কেনারামরা জিনিসপত্রের অবস্থা, সেলাই অথবা রঙ পরিবর্তন দেখে সেই Wrong door-এর কাছে যে দ্বিতীয়বার যাবেন না এটা তাদের মনে থাকে না। প্রত্যেকের কাছে তারা যেন একবারই ব্যবসা করতে চান। কোনোকিছুর গুডউইল তার প্রসারের জন্য কতখানি প্রয়োজনীয় তা কে বুঝাবে। সাধারণ লোকেদের যে কিনতেই হয় তারা এমন কিছু পুলিশ বা কাস্টমস-এর লোক নন যে, লোকে ভালবেসে এটাসেটা দেবে, আদৌ কেনার দরকারই পড়বে না।

নতুন একটা কাপড় নিয়ে এসে প্রথম ধোয়াতেই বানের জলের মতো রঙের ঢল নামল। কোনোভাবে সেটাকে তুলে নিয়ে একেবারে সাদা হওয়া থেকে রক্ষা করা গেল। কিন্তু সেই বহিষ্কৃত রঙ অন্য কাপড়ে অনুপ্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসে গেল। তাও গণতন্ত্রের মতো সর্বত্র সমতা থাকত তো চলত। তা নয়, ধন বণ্টনের চরম বৈষম্যের মূর্তিমান উদাহরণ হয়ে রইল।

তৈরি পোশাক নিয়ে জনৈকা মহিলা বিক্রেতাকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা সেলাই-এর পাশ দিয়ে একটু বেশি কাপড় রাখতে পারেন না? তা হলে টেকে।'

রসিক বিক্রেতার উত্তর, 'এও এক ধরনের ডাক্তারি, কারো শরীর যেন মোটা না হয়ে পড়ে তার ব্যবস্থা রাখা।' বিক্রেতা হিসেবে তাবৎ দুনিয়া মাত

করছে যারা তারা বেশিরভাগ সিন্ধু প্রদেশ অথবা গুজরাট থেকে এসেছে। ব্যবহার, আচারে, জিনিসপত্রের গুণবর্ণনায় এরা অসম্ভব পারদর্শী। এদের পাল্লায় পড়ে মাথার টুপি কিনতে গিয়ে ছাতা কিনে আনাও অসম্ভব নয়। একটা টুপি একটা মাথার কাজে লাগে কিন্তু একটা ছাতা একসথে বহু মাতাকে আশ্রয় দেয়, তা ছাড়া ছাতা দিয়ে কুকুর খেদানো যায়, সামান্য ব্যবহার করে ভিড়ে পথ পরিষ্কার করা চলে। টুপির এহেন বহুবিধ ব্যবহার কেউ কখনও শোনে নি... ইতাদি ইত্যাদি শুনে, প্রভাবিত ক্রেতা হৃষ্টচিত্তে ছাতা হাতে রওনা দিতে পারেন।

ক্রেতার প্রতি ঠিক এর বিপরীত মনোভাব লিবিয়ার বিক্রেতার। নির্বিকারচিত্তের দার্শনিকের মতো বসে থাকাতেই তাদের আনন্দ। ছাদের কাছাকাছি রডের হ্যাঙ্গারে ঝুলন্ত কাপড়ের সাইজ দেখে বুঝতে হত। আসলে লিবিয়ান ক্রেতাও তেমনি। ওরা অযথা সাইজ নিয়ে খুঁতখুঁত করে না। প্রায়শই চার বিবি এবং গোটা পঁচিশেক বাচ্চাকাচ্চার সংসারে কারো না কারো লাগবেই, তারা জানে, আর এর সাথে বিবিদেরও যদি পুরনো সংসারের পুত্র-কন্যারা থাকে তবে তো কথাই নেই। এদের মধ্যে আবার এ জাতীয় মিলমিশ থাকার প্রবণতা দারুণ। প্রতিটি ব্যাপারেই 'সবই তাঁর ইচ্ছা এবং তিনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন' এই দার্শনিক মতবাদের প্রভাব রয়েছে। এই মনোভাবই যে ক্রেতা হিসেবে তাদের কতখানি আকর্ষণীয় করেছে তারও প্রমাণ দিই।

একবার আমার জুতো পছন্দ হল। সাইজ দেখে অবাক। ৩৫ আর ৩৭। বিক্রেতাকে অনুরোধ করাতে তিনি আতিপাতি করে খুঁজে বুঝলেন, কেউ ভুলবশত আরেক জোড়া এভাবেই নিয়ে গেছে।

এর চেয়ে সাংঘাতিক আমার এক বন্ধুর অভিজ্ঞতা। তিনি নাকি এক জোড়া জুতো পেয়েছিলেন। দুটোই বা পায়ের। সর্বনাশ। আমার জীবনে আমি দুই ডান পাওয়ালা লোক দেখি নি। দেখতে চাইও না। সেই বেচারাম কিন্তু নির্বিকার; দুই যান পা যখন কেউ নিয়ে গেছে দুই বাম পাও কোনো ব্যাপার না।

মাতাল
আহসান কবির

মা'র কাছে শুনেছি, আমাকে শিশুকালে ঘুম পাড়ানো হত রঙ্গিলার ভয় দেখিয়ে। রঙ্গিলা খুলনার ক্রিসেন্ট জুট মিলে সুইপারের চাকরি করত। চোলাই মদ খেয়ে মাতলামী করা আর প্রলাপ বকতে-বকতে পথ হেঁটে সুইপার কলোনির বাসায় ফেরা ছিল তার নিত্য রাতের অভ্যাস। ছোট ছেলেমেয়েরা রঙ্গিলার ভয়ে রাতের বেলা ক্রিসেন্ট জুট মিলের কোনো রাস্তা দিয়েই হাঁটত না।

ক্লাশ থ্রিতে পড়ার সময় একদিন রাতে আমি আর আমার বড় ভাই বাসায় ফিরছিলাম। রাস্তায় রঙ্গিলার মুখোমুখি হতেই আমি ভয়ে বড় ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। রঙ্গিলা তার স্বভাব সুলভ দরাজ অথচ জড়ানো গলায় বড় ভাইয়াকে বলেছিল, 'এই ছোঁড়া, বল তো আমি কে?' বড় ভাইয়া বুদ্ধি করে জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনি ক্রিসেন্ট জুট মিলের এক সময়ের মালিক প্রিন্স করিম আগা খানের ছোট ভাই।' রঙ্গিলা বড় ভাইয়ার কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। কান্না জড়ানো গলায় বলেছিল, 'শুধু তুই চিনলিরে ছোঁড়া, আর কেউ চিনল না এই রঙ্গিলারে।'

দিনের বেলায় রঙ্গিলা যখন ঘরদোর পরিষ্কার করতে আসত, তখন সে থাকত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ, একেবারেই শান্ত প্রকৃতির। তাকে তখন কেউ মাতাল বললে সে খুব জোর গলায় প্রতিবাদ জানাত। বলত, 'বাবুজী সবাই মাতাল হতে পারে না, মাতাল হওয়া বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কেউ-

কেউ মাতাল হতে পারে, তবে বেশিরভাগ মদ খাওয়া মানুষেরা মাতাল হওয়ার ভান করে।'

বড় হয়ে আমি অবশ্য একজনকেই মাতাল বলেছিলাম। তার নাম বাবু। প্রতি রাতে মদ খেয়ে প্রলাপ বকা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন বাবুর বাবা-মা'র অনুরোধে ওকে ঢাকার শুক্রাবাদের এরাম বার থেকে খুঁজে বের করলাম। বাসায় ফেরার পথে বাবু হেড়ে গলায় গান গাচ্ছিল, প্রলাপ বকে যাচ্ছিল। আমি মানা করতেই বাবু রেগেমেগে বলেছিল, 'তুই চুপ কর শালা। পয়সা খরচ করে মদ গিলেছি না? মানুষ যদি নাই জানতে পারল যে আমি মদ খেয়েছি, তা হলে পয়সার শ্রাদ্ধ করলাম কেন? আমি সারা পৃথিবীকে জানাব এখন।'

সেই বাবুকে এখন মাতাল বললে সেও রঙ্গিলার মতো জোর গলায় প্রতিবাদ জানায়। সে বলে, 'মাতাল শব্দটি মদ থেকে এসেছে। আমি তো এখন আর মদ খাই না, ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং আমি কেন মাতাল হতে যাব? আমি এখন সংগীতজ্ঞ তানসেনের মতো রাজার নেশা গাঁজা সেবন করি। সে কারণে আমাকে বড়জোর টাল বলা যেতে পারে।'

বাবু ব্যাণ্ড সংগীত লেখে, সুর দেয়, কখনও-কখনও নিজেও গায়। আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, 'মদ থেকে যেমন মাতাল, গাঁজা থেকে তেমন গেঁজেল হতে পারে, 'টাল' কীভাবে হয়?'

বাবু বিজ্ঞের মতো বলেছিল, 'সেটা বোঝা তোর মতো আঁতেলের কম্মো নয়। মাছকে আমরা মৎস্য বলি, গাছকে কেন গৎস্য বলি না বল তো?'

আমি কোনো উত্তর খুঁজে পাই নি। তবে এবারের ঈদের ছুটিতে বাবু ম্যানহোলে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। হাসপাতালে তাকে দেখতে যাওয়ার পর আমাদের ডাক্তার বন্ধু মিল্টন বলল, 'বাবু খুবই সস্তায় লো কোয়ালিটির গাঁজা কিনে খাচ্ছে। খুবই খারাপ লক্ষণ। আজ পড়েছে ম্যানহোলে, দু' দিন পরে হয়তো খবর পাব বাবু ট্রাকের চাকার সাথে মিতালী করেছে।'

তবে সুরা বা মদের সাথে প্রকৃত অর্থেই যিনি নাকি মিতালী করতে পেরেছিলেন, তার নাম ওমর খৈয়াম। তিনি লিখেছিলেন, সঙ্গে রবে সুরার পাত্র, অল্প কিছু আহার্য মাত্র, আর একটি বই হাতে নিয়ে, অন্য হাত দিয়ে অবশ্য তিনি প্রিয়াকে জড়িয়ে ধরার কথাই লিখেছিলেন।

মার্কিন মুল্লুকের একটি পত্রিকায় একবার মদ সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প, কবিতা, গান, বিভিন্ন মদের নাম ও দাম প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে মদ সম্পর্কে ওমর খৈয়ামের লেখাগুলো খুব গুরুত্ব সহকারে ছাপানো হয়েছে। ওমর খৈয়াম লিখেছিলেন, 'সাকী পান পাত্র পূর্ণ করে দাও। যেটা অতীতের ভয়-ভীতি দূর করে দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা রাখ তুলে। সুরাই শুধু আগামীকে অতীতে টেনে নেয়।' ওমর খৈয়ামের লেখালেখি, তার জীবনবোধ আর মদ খাওয়া নিয়ে বিস্তর কেচ্ছা-কাহিনী প্রচলিত আছে। ঢাকা শহরের এক বিখ্যাত কবি একবার আমাকে ফান করে বলেছিলেন, যারা পয়সা খরচ করে মদ খেতে পারে না, তারা ওমর খৈয়ামের কবর দেখতে চায়। তার কবরের কাছে গেলেই নাকি মদের গন্ধ পাওয়া যায়। ঘ্রাণেই অর্ধভোজন (নাকি অর্ধপান) সুতরাং কেউ কি সুযোগ হাতছাড়া করে?

আমি অবশ্য এই বিখ্যাত কবির সাথে সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করতাম না। তিনি নিয়মিত যে বারে বসে মদ পান করতেন, সেখানে একটা দেওয়াল লিখন ছিল এমন, 'ওরা তো অন্য জাতের লোক, যারা সুরা পান করে জীবনকে ভুলে যাবার জন্য! আমার তো সুরা পানের প্রয়োজন হয় জীবনকে ফিরে পাবার জন্য।' একদিন এই কবি আকণ্ঠ পান করে জোসনা রাতে আমাকে নিয়ে পথ হাঁটতে চাইলেন। আমি তার সঙ্গে হাঁটতে থাকলাম। ধানমণ্ডি ব্রিজের উপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমরা এখন কোথায়? খুব উঁচু পথে হাঁটছি বোধ হয়। দেখ, ওই দেখ আমাদের নিচে পড়ে আছে চাঁদ!'

আমি খেয়াল করলাম, বিদ্যুৎ না থাকার কারণে এই চাঁদনী রাতে ধানমণ্ডি লেকের পানিতে চাঁদটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। কবির অবস্থা বুঝে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে একটা রিকশা ভাড়া করে আমি কবি মশাইকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম।

একবার কোলকাতার একজন বিখ্যাত লেখক এলেন বাংলাদেশে। তার সম্মানে ঢাকার নামী এক প্রকাশক পার্টি দিলেন। সেই পার্টিতে আকণ্ঠ মদ গিলে আমার পরিচিত কবির অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল। আমি তাকে বাসায় পৌঁছে দিতে গেলাম। মাঝ রাত। বাড়ির গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কবি মশাই দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তার দিকে তেড়ে এল বাড়িওয়ালার পোষা কুকুর। কবি মশাই তো 'বাবা গো',

'গেলাম গো' বলে অস্থির। কুকুর তার কাছে এসে তাকে চিনতে পারল। ঘেউঘেউ করা থামিয়ে উল্টো লেজ নাড়তে থাকল। কবি মশাই তখন জড়ানো গলায় চিৎকার করে বললেন, 'এই ইতর, কেডা তোরে কুত্তার সার্টিফিকেট দিছে? তুই হালায় চোরও চিনস না, কবিও চিনস না! কোন... কির পোলা তোরে....'

কবির চিৎকারে বাড়িওয়ালার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি কবিকে বাসায় নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পরে বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক কুকুরকে দেওয়া কবির ঝাড়িকে বছরের সেরা ঘটনা বলে উল্লেখ করেছিলেন।

কয়েক বছর আগে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকা একবার দুটি কৌতুককে বছরের সেরা কৌতুক হিসেবে বিবেচিত করেছিল। সেই কৌতুক দুটিও ছিল মাতালদের নিয়ে।

এক পুলিশ সার্জেন্ট গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। পথে সে দেখল এক লোক অদ্ভুতভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। তার বাম পা আইল্যাণ্ডের উপর আর ডান পা রাস্তায়। লোকটিকে এভাবে হাঁটতে দেখে গাড়ি থামাল পুলিশ সার্জেন্ট। কাছে গিয়ে বুঝল লোকটা মাতাল। সার্জেন্ট তাকে রাস্তায় নামিয়ে এনে বলল, 'এবার হাঁটুন'। মাতাল লোকটি খুব বিনীতভাবে বলল, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার সাহেব। আমি জন্ম থেকেই বোধহয় খোঁড়া। তাই খুব কষ্ট ছিল মনে। আমার বাম পা-টা ঠিক করে দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সার্জন!'

মাঝরাতে এক লোক একটি লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে কী যেন খুঁজছিল। পেট্রোল-পুলিশ এসে তাকে বলল, 'কী খুঁজছেন? এখানে কেউ নেই, কিছু নেই তো।' মাতাল লোকটি বলল, 'ঠিকই ধরেছেন। আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই নিচতলায়। সেখানে কেউ নেই, অন্ধকার। আর সে কারণেই আমি কলিংবেলটা খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ উপরে তাকিয়ে দেখুন, আমার বাসায় ঠিকই বাতি জ্বলছে। এখন কলিংবেলটাকে খুঁজে পাই কীভাবে?'

তারাপদ রায় একবার তার কিছু রম্য লেখা নিয়ে বই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বই-এর একটি ভালো নাম কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারাপদ রায়ের এক বন্ধু তার রম্য লেখাগুলো পড়ে বইটার নাম রাখলেন 'দুই মাতালের গল্প'। নামটা মেনেনেওয়ার পর তারাপদ রায় পড়েছিলেন আর এক বিপদে। বইটি কোন দু' জন মানুষকে উৎসর্গ করা যায়? পরে তারাপদ রায় অবশ্য তার 'দুই মাতালের গল্প' বইটি উৎসর্গ

করার জন্য বিশিষ্ট দু' জনকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই বিশিষ্টরা হচ্ছেন বাংলাদেশের দু' জন বিখ্যাত কবি! রফিক আজাদ এবং বেলাল চৌধুরী।

কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ডাক্তার বলেছিল নেশা কিংবা জীবন যে কোনো একটিকে বেছে নিতে। রুদ্র নাকি জবাব দিয়েছিলেন, জীবনের নেশা এবং জীবনব্যাপী নেশা কোনোটাকেই তিনি ছাড়তে পারবেন না। সে যাই হোক একদিন মাঝরাতে তিনি খেয়েদেয়ে ফিরছেন। হঠাৎ চাঁনখারপুল মোড়ের একটি সাইনবোর্ড তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি দৌড়ে গেলেন সেই সাইনবোর্ডের কাছে। সাইনবোর্ড ভেঙে বগলদাবা করে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন ভার্সিটি ক্যাম্পাসের দিকে। তার এক বন্ধু বগলদাবাকৃত জিনিসটি দেখিয়ে জানতে চাইল, 'কী জিনিস?' রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন, 'ট্যাক্স দিই না? জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় পুলিশের বেতন হয়। পুলিশের কাম পুলিশ করবে। ঘুষ খায় খাক, চোরও ধরবে। পুলিশের কাজ এলেমরা করবে কেন? এক দেশে কি দুই নিয়ম থাকা চলে?'

রুদ্রের বক্তৃতা শুনে তার বন্ধু তেমন কিছু বুঝল না প্রথমে, পরে ভাঙা সাইনবোর্ডটা পড়ে সবকিছু বুঝল। সাইনবোর্ডে লেখা ছিল, 'এখানে এলেম দ্বারা চোর ধরা হয়'।

বহু দিন পর এবারের ঈদের ছুটিতে যেয়ে রঙ্গিলাকে খুঁজে বের করলাম। যাওয়ার পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির পরে সুন্দর বাতাসে খুলনার খালিশপুরের এক শুড়িখানার সামনে রঙ্গিলাকে দেখলাম। বড়-বড় চুলগুলো উড়ছে। চুলগুলো পেকে সাদা হয়েছে। জটাধারী রঙ্গিলা তার সঙ্গী মাতালদের উদ্দেশে বল্ছিল, 'উহু! কী সুন্দর বাতাস। মন কেমন-কেমন করে। এই সুবাতাস আইজ আছে, কাইল নাই!'

বহু দিন পরে রঙ্গিলাকে দেখে ভয় পাই নি। তবে রঙ্গিলার কথা শুনে ওমর খৈয়ামের কিছু জনপ্রিয় লেখা মনে পড়ল, তেমন একটি লেখায় ওমর খৈয়ামের উপদেশ ছিল :

তুমি জান না তুমি কোথা থেকে এসেছ
সুতরাং পান কর
তুমি জান না তোমার পূর্ণ অতীত
সুতরাং পান কর
তুমি জান না তোমার বাকিটা ভবিষ্যৎ
সুতরাং পান কর...।

হাবিজাবি

হোসেন তৌহিদ জুয়েল

'ছেলেটা দেখতে লম্বা আর ফর্সা'– যখন কোনো মেয়েকে একটি ছেলে সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার সময় এই দুটো জিনিস উলেখ করা হয়, তখন প্রায় সব মেয়েরাই মনে-মনে ভেবে বসে, ছেলেটি লম্বা আর ফর্সা? তা হলে তো নির্ঘাত দেখতে খুব হ্যাণ্ডসাম হবে। কিন্তু লম্বা আর ফর্সা হওয়ার পরেও যে একটি ছেলের চেহারা গর্দভের মতো হতে পারে এটা যদি কোনো মেয়ের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়, তা হলে আমার ঠিকানায় তিনি যোগাযোগ করতে পারেন। লম্বা আর ফর্সা তবে চেহারাটা গবেটের মতো। এই ধরনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখানোর জন্য আমি নিজেকে যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করি।

আমার চেহারাটা আসলেই একটু গবেট মার্কা। নিজের চেহারা সম্পর্কে এই ধারণা শুধু আমার একার না, আমার সব বন্ধুদেরই একই ধারণা। শুধু আমার বন্ধুরাই যে এই রকম ধারণা করে বসে আছে তা নয়। যে-কোনো লোকই প্রথম-প্রথম আমাকে দেখলেই গবেট টাইপের কিছু একটা বলে সন্দেহ করে। বিশ্বাস করুন, ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর ধরে লেখাপড়া করছি অথচ এই সাড়ে তিন বৎসরে ক্যাম্পাসে নতুন আসা অনেক অপরিচিত লোকজনদেরকে আমি আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, 'ভাই আই. বি. এ'র বিল্ডিংটা কোন দিকে বরতে পারেন?' 'ইকনোমিক্স ডিপার্টমেন্টটা কোথায় জানেন?' কিংবা 'নীপা

ভবন কোন দিকে?' ইত্যাদি। কিন্তু আমাকে গত সাড়ে তিন বছর দরে অপরিচিত লোকজনেরা কেবর একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেছে, 'ভাই, বাথরুমটা কোনদিকে বলতে পারেন?' গত সাড়ে তিন বৎসর ধরে এই প্রশ্নটি শুনতে-শুনতে আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এখন যখনই কাউকে আমার সামনে কৌতূহলী দৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে দেখি তখনই আমি তাকে বিনীতভাবে বলি, 'আপনি কি বাথরুম কোথায় সেটা জানতে চান?'

কয়েক দিন আগে অবশ আমার এ সাড়ে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় প্রথম বারের মতো একটি ব্যতিক্রম ঘটে গেল। আমি কলাভবনের পেছনের দিকে একটি সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম গাড়ি থেকে নেমে চল্লিশোর্ধ এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমার সামনে এসে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাবেন ঠিক তখন আমি নিজ থেকেই বললাম, 'আপনি কি বাথরুম খুঁজছেন? সোজা গিয়ে ডান দিকে চলে যান। তারপর একেবারে নাক বরাবর সোজা হাঁটতে থাকুন। একেবারে শেষ মাথায় গেলেই এখান থেকে কলাভবনের ভিতরের সবচেয়ে কাছের বাথরুমটি খুঁজে পাবেন। আর যদি আপনার খুব তাড়া থাকে,তা হলে ওই যে 'গরিব চত্বর' লিখা দেওয়ালটা দেখছেন, ওখানেই দাঁড়িয়ে কাজটা সারতে পারেন। তা ছাড়া আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কলাভবনের বাথরুমগুলোর ভিতরে এত সুগন্ধ থাকে যে তা আপনার কাছে সহ্য নাও হতে পারে। তাই ওই দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়েই কাজটা সম্পন্ন করা উত্তম বলে আমি মনে করি।' ভদ্রলোক আমার দিকে বিরক্ত সহকারে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কাছে বাথরুম কোন দিকে সেটা জিজ্ঞেস করেছি? আমি জানতে চাচ্ছি, সোশলজি ডিপার্টমেন্টটা কোথায়? বলতে পারেন?' ভদ্রলোকের কথাটা মুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার ক্যাম্পাস-জীবনে এই প্রথম একজন বাথরুম ছাড়া অন্যকিছু বিসয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে। আমি আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলাম। আমি এতই আনন্দিত হয়ে উঠলাম যে ঠিক করলাম ভদ্রলোককে সোশলজি ডিপার্টমেন্ট কোথায় তা শুধু বলেই দিব না, উনাকে সেখানে পৌঁছে দিয়েও আসব। বললাম, 'আসুন, আমার সাথে আসুন।' ভদ্রলোক আমার পেছনে-পেছনে আসতে লাগলেন। কিন্তু আমি এতই আনন্দিত হয়ে পড়লাম যে কলাভবনের এক তলার সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়েই ভুলে গেলাম

সোশলজি ডিপার্টমেন্টটা কোথায়। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের তুলনায় সোশলজি ডিপার্টমেন্টটায় মেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বলেই এই ডিপার্টমেন্টের আশেপাশে আমি গত সাড়ে তিন বৎসরে প্রচুর ঘুরাঘুরি করেছি। অথচ কী আজব ব্যাপার, ডিপার্টমেন্টটা কোথায় তা আমি এখন মনে করতে পারছি না! স্ট্রেইঞ্জ! আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গলার স্বর কিছুটা নিচু করে বললাম, 'ইয়ে মানে, আমি আসলে সোশলজি ডিপার্টমেন্টটা কোথায় তা খুব ভালো করেই জানি কিন্তু এই মুহূর্তে ঠিক সেটা মনে করতে পারছি না। আপনি বরং এক কাজ করুন আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমার কাছে দিয়ে রাখুন। আমি পড়ে একসময় ফোন করে আপনাকে তা জানিয়ে দিব।' ভদ্রলোক কড়া চোখের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। ফিসফিস করে ইডিয়ট বা ননসেন্স এই ধরনের কিছু একটা বলে আমার সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলেন।

আমি যে গবেট টাইপের পাবলিক সেই ব্যাপারে আপনারা বোধহয় পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেছেন। যাইহোক, গবেট হওয়া সত্ত্বেও আমি আরও আট-দশটা ছেলের মতোই একটা স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। স্বপ্নটা ছিল একটা প্রেম করার। বিলিভ ইট অর নট, লেখাপড়া করার জন্যই হোক বা রাজনীতি বা অন্যকোনো কারণেই হোক না কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবার সময় থেকে সব ছেলেরাই কেটা কমন স্বপ্ন দেখতে থাকে আর তা হল একটা মেয়ের সাথে প্রেম করা। এদের মধ্যে কেউ-কেউ সফল হয়, আর কেউ-কেউ হয় বিফল। যারা বিফল হয়, তারা কখনো না কখনো মনে-মনে ভাবে, 'কী লাভটা হল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে? একটা প্রেমও করতে পারলাম না... শিট।' আমিও 'শিট... ও... শিট...' বলেই সাড়ে তিনটা বৎসর পার করে দেবার পর হঠাৎ এক কোকিলের ডাক শুনে পুলকিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলাম, যে আমাকে ডেকেছে সে কোকিল কণ্ঠী হলেও আসলে সে কোনো কোকিল নয়, সে হল একটা কাউয়া। হাইফাই ক্রো। কিন্তু তারপরও হাজার হলেও এটাই তো আমার জীবনে পাওয়া প্রথম প্রেমের অফার। আমি কীভাবে ফিরিয়ে দিই তাকে? আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। আমি তার অফার গ্রহণ করলাম। মেয়েটা একটা ভাজ করা চিঠি আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমি শিহরতি হয়ে চিঠিটা বুক-পকেটে রেখে দিলাম। বাসায় এসে চিঠিটা পড়লাম। ছোট্ট চিঠি।

চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই। কিংবা যে লিখেছে তার নামও নেই। চিঠিতে শুধু লিখা, 'বৃহস্পতিবার বিকাল চারটায় কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার মূর্তিটির সামনে আসবেন। নীল রঙের একটা শাড়ি পরে আমি সেখানে থাকব।' আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বৃহস্পতিবারের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকলাম। জীবনের প্রথম ডেটিং। কী পরে যাব সেটা নিয়ে একের পর এক চিন্তা করতে লাগলাম। বিভিন্ন ম্যাগাজিন ঘাটাঘাটি করলাম। কোন নায়ক তার জীবনের প্রথম ডেটিংয়ে কী পরে গেছে সেটা খুঁজে-খুঁজে পরতে লাগলাম। যাচ্ছি এক কাউয়ার কাছে, তারপরেও তো একটু ফিটফাট হয়ে যাওয়া দরকার। কয়জনেরই বা সৌভাগ্য হয়, কাউয়ার অফার পাবার।

দেখতে-দেখতে বৃহস্পতিবার চলে এল। আমি খুব ফিটফাট হয়ে যথাসময়ে চলে এলাম। কলাভবনের মূর্তিটির সামনে। কিন্তু মূর্তিটির সামনে এসেই আমি থমকে গেলাম। একি দেখছি আমি? সেই মেয়েটি ঠিকই নীল রঙের শাড়ি পরে মূর্তির পাদদেশে বসে আছে। তবে সে একা নয়। তার সাথে একটি ছেলেও আছে। ছেলেটির সাথে খুব হেসে-হেসে কথা বলছে সেই মেয়েটি। আমি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ করে চার-পাঁচটি মেয়ে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। গোঁফওয়ালা একটি মেয়ে রুক্ষ কণ্ঠস্বরে আমাকে বলল, 'মম আপা কি আপনাকেও চিঠি দিয়েছে?' আমি বেশ থতমতো খেলাম। কি সব উল্টাপাল্টা বকছে এরা। মম আপাই বা কে? গোঁফওয়ালা মেয়েটার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। নীল রঙের শাড়ি পরা যে মেয়েটা আমাকে চিঠি দিয়েছে সেই হচ্ছে এই গোঁফওয়ালা মেয়ে আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের মম আপা। এই মম আপা হচ্ছে হলের এক নেতা টাইপের মেয়ে। প্রেমিকা খুঁজছেন তিনি। এই জন্য আমার মতো এই রকম আরো অনেককে তিনি ইন্টারভিউ কার্ড (চিঠি) দিয়েছেন। গোঁফওয়ালা মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'কই চিঠিটা এনেছেন? দেখি তো চিঠিটা?' চিঠিটা আমার পকেটেই ছিল। কিন্তু সেই চিঠিটা আমি কেন এই গোঁফওয়ালীকে দেখাব? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে গোঁফওয়ালা মেয়েটা হুঙ্কার দিয়ে বলল, 'চিঠি দেখান।' আমি ভয়ে প্যান্টের পকেট থেকে চিঠিটা বের করলাম। মেয়েটা চিঠি দেখে বলল, 'ঠিক আছে। আপনার সিরিয়াল নম্বর হল আঠার। ওই যে লাইনটা

দেখছেন, ওখানে গিয়ে দাঁড়ান।' আমি ঘুরে তাকাতেই দেখলাম মূর্তির ডানদিকে এরই মধ্যে লম্বা একটা লাইন হয়ে গেছে। আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার সামনে সতের নম্বর যে ক্যান্ডিডেট আছে, সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন তো ভাই, কি লজ্জার মধ্যে পড়ে গেলাম। চিঠিটা পেয়ে আমি আমার জীবনের প্রথম ডেটিং ভেবে আমার কয়েকজন বন্ধুদেরকে নিয়ে এসেছি। আর এখানে এসে দেখি এই কাণ্ড। বন্ধুরা সব এখন তাকিয়ে-তাকিয়ে হাসছে।' আমি মনে মনে খুশিই হলাম। ভাগ্যিস আমি আমার কোনো বন্ধুকে চিঠির কথাটা বলি নি। আমি সেই সতের নম্বর ক্যান্ডিডেটকে বললাম, 'তা আপনি যখন এতই লজ্জা পাচ্ছেন তখন দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলে গেলেই তো পারেন।' সে আমার দিকে বিরক্ত-মাখা স্বরে বলল, 'চলেই তো যেতাম। কিন্তু উপায় নেই। ওই যে নাকের তলায় লোমওয়ালা মেয়েটাকে আর তার গ্রুপকে দেখছেন ওরা সাংঘাতিক ডেঞ্জারাস পাবলিক। একটা ছেলে চলে যেতে চেয়েছিল। তাকে ধরে ওরা দশবার কান ধরে উঠবস করিয়েছে।

লাইনটা আস্তে-আস্তে দীর্ঘ হচ্ছে। তবে আমরা আস্তে-আস্তে সামনের দিকে সেই মম আপা নামের দাড় কাকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একসময় আমার ডাক পড়ল। আমি এগিয়ে কাউয়া টাইপের মেয়েটার কাছে যেতেই মেয়েটা আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটা করল সেটি হচ্ছে, 'আচ্ছা বলুন তো কলাভবনে সব মিলিয়ে কয়টি বাথরুম আছে?'

ময়না কহ তারে...
মোকাম্মেল হোসেন

: সৈকত ভাই!

: জ্বি বলেন।

: আপনি কি এই মুহূর্তে অভিভূত হতে চান?

: অভিভূত বা দ্রবীভূত, কোনোটাই হতে চাই না।

: তা হলে?

: যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই

: বলে কি! কীসের?

: আপনার।

: ভাই কি মাইণ্ড করলেন?

: কিছুটা।

: আমি আরও ঠিক করে রেখেছি, ফাস্ট আপনাকে দেখাব!

: কী দেখাবেন?

: ময়না!

: ময়না?

: হ্যাঁ ময়না। একদম খাঁটি পাহাড়ি ময়না। আজ সকালেই কিনেছি এগার শ' দিয়ে।

: ময়না দিয়ে কী হবে?

: অভিভূত হবার ব্যাপারটা তো এখানেই! আগে ময়নাটা দেখেন।

আনব?

: কি আর করা! আপনার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওই বস্তুটা না দেখিয়ে আপনি ছাড়বেন না। আনেন দেখি...

: থ্যাঙ্ক'য়্যু সৈকত ভাই!

মিনা হাউজের নিচ তলার তিনটি রুমে আমরা থাকি মোট ছ' জন। প্রতি রুমে দু' জন করে ব্যাচেলরের সহাবস্থান। এই ছ' জনের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে নান্দাইলের লিয়াকত; উত্তরের রুমটায় পিয়াল-এর সাথে যে থাকছে আজ প্রায় মাস ছয়েক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পর লিয়াকত একটি বেসরকারি ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগ দিয়েছে এবং অতি সম্প্রতি এক তরফা প্রেমে পড়েছে মিনা হাউজের ঠিক বিপরীতমুখী বাসার দোতলার জনৈকার সাথে। ওর এই প্রেমে পড়া নিয়ে আমরা বাকিরা সবাই এক ধরনের কৌতুক অনুভব করলেও ও যে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিয়েছে তার স্বাক্ষর ইতোমধ্যেই সে রেখেছে স্ব-সংঘটিত একাধিক কার্যকলাপে। কিন্তু হঠাৎ লিয়াকতের ময়না-প্রেমী হয়ে উঠার রহস্য কী? নাহ্! কোনো দিশা পেলাম না।

লিয়াকত তার ময়নাসমেত খাঁচাটি বার কয়েক আমার চোখের সামনে দুলিয়ে বলল, লুক্!

: হুঁ! দেখলাম!

: কী বুঝলেন?

: দেখে তো মনে হচ্ছে ময়নাই! কিন্তু এ যে একেবারে বাচ্চা!

: হেঃ হেঃ হেঃ! হাতেখড়ি দেবার জন্য এই বয়সটাই তো উপযুক্ত!

: হাতেখড়ি? ময়নাকে আপনি ইশকুলে পাঠাবেন নাকি?

: স্কুলে ঠিক পাঠাব না, তবে শিক্ষিত করে তুলব!

: কী রকম?

: বলেছিলাম না, আপনাকে অভিভূত করে দেব?

: রহস্য না করে বলুন তো ব্যাপারটা, আসলে ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে!

: আমার ময়নাকে আমি এখন থেকেই একটি মাত্র বাক্য–আমি তোমাকে ভালাবসি কণ্ঠস্থ করাব!

: তারপর?

: পাঠ শেষে জানালার ধারে রেখে দিয়ে ময়নাকে বলব, ও বাসার

জানালায় মুখ দেখলেই... । হেঃ হেঃ হেঃ । অনামিকা, সাড়া না দিয়ে তুমি যাবে কোথায়? কি, আইডিয়াটা কেমন?

: সত্যিই অভিভূত হবার মতো । কিন্তু নাম জানলেন কীভাবে? আলাপ হয়েছে নাকি?

: নারে ভাই, নাম জানতে পারি নি এখনো । নাম জানলে কি আর অনামিকা বলি?

পরদিন থেকেই লিয়াকতের ময়না-প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেল– 'কও ময়না কও, আমি তোমায় ভালবাসি' ।

মাঝখানে প্রায় দেড় মাসের মতো ঢাকার বাইরে ছিলাম পেশাগত কারণে । ফিরে আসার পর লিয়াকতকে কেমন জানি উদাস-উদাস মনে হচ্ছিল! একথা-সেকথার পর জিজ্ঞেস করি, আপনার ময়না বিষয়ক খবর বলেন ।

: খবর খারাপ ।

: খারাপ! কেন কী হয়েছে?

: কী আর হবে! সবই এই কপাল । বুঝলেন, অভাগা যেদিকে চায়...

: ময়না কি খাঁচা থেকে উড়ে গেছে?

: নাহ্! উড়ে নাই । আমিই উড়াইয়া দিছি ।

: বলেন কি? হঠাৎ...

: ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটল । আপনি সিলেট যাবার পর একদিন কাঁচা বাজারে গেছি; দেখি ব্যাগ হাতে আমার সেই অনামিকা দাঁড়ান ।

: তারপর?

ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়ে আপনার নামটা...

: বলল?

: প্রথমে কিছুক্ষণ ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল । তারপর বলল, আমার নাম জমিলা ।

: জমিলা?

: আহা শুনুন না! নাম শুনে দিলে জবর চোট খেলেও ভাবলাম, নামে কিবা আসে যায়? নামটা একটু ছেঁটে দিয়ে মিলা বলে ডাকব । কিন্তু...

: কিন্তু কী?

: কিন্তু এরপর যে তথ্য উদঘাটিত হল...

: যেমন?

: নাম-পর্ব শেষে লেখাপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হেসে বলল, আমি ওই বাসাত কাম করি।

: স্ট্রেঞ্জ!

: আর একটু বাকি আছে। এ কথা শুনে সেদিন বাজার না-করেই মেসে ফিরে এলাম। ফিরে দেখি আমার ময়নাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা জটলা!

: জটলা?

: হ্যাঁ, জটলা। বাজারে যাবার আগে বুয়াকে বলেছিলাম ময়নাকে গোসল দেওয়ার জন্য। গোসল দিতেই চিচিংফাঁক। তাই নিয়ে সবার বৈঠক।

: বুঝলাম না!

: ওটা আসলে ময়না ছিল না সৈকত ভাই। শালিকের বাচ্চারে রঙ দিয়া ময়না কইয়া আমার কাছে বেইচ্যা গেছে হারামজাদা!

: এত বড় প্রতারণা?

: হাঁ, সৈকত ভাই! নিয়তি আমার সাথে যে প্রতারণা করেছে তার তুলনায় এটা তো কিছুই না।

: তো এরপর ময়না সরি শালিকটাকে আপনি উড়াইয়া দিলেন ঠিক কি না?

: ঠিক। উড়াইয়া দিয়া কইলাম, যা শালিকের বেটি যা। আমার হৃদয় খানখান করা বেদনার এই কাহিনী যদি পারস, আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দে!

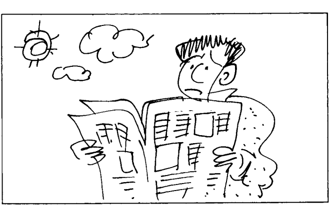

এখানেই ভেঙেছে পা আমার প্রিয়ার

মাহবুবুল আলম মাসুদ

বেকারজীবনে যা হয় আর কি। যেদিন কাজ থাকে সেদিন চারদিক অন্ধকার। ইউরিনটা টেস্ট করে আন, বারুমের পাইপ বন্ধ হয়ে গেছে সুইপারকে খবর দে, কাজের মেয়েটা হাত কেটে ফেলেছে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যা, আরো বলব? না থাক। এ ফিরিস্তি ছোট থাকাই ভালো আবার যেদিন কাজ থাকে না সেদিন বসে-বসে মাছি মারা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। কী করব? চায়ের দোকানে বসতে টাকা লাগে, পার্কে বসতে বান্ধবী লাগে (একাও বসা যায় কিন্তু সবাই যেখানে জোড়ায়-জোড়ায় বেজোড় সংখ্যা সেখানে বড়ই বেমানান)। এ ছাড়া তো আর করার কিছু নেই। তাই বসে-বসে মাছিই মারি।

আজ আমার সেই মাছি মারার দিন। এমনকি প্রতি সকালের যে ভয়াবহ কাজ (পঞ্চাশ টাকায় মাছ তরকার কিনে আনা ভয়াবহ তো বটেই) সেই বাজারটাও করতে হয় নি। আব্বা করেছেন। এখন বিকেল। আমি ফুটপাথ ধরে– মাপ করবেন রাস্তা ধরে (ফুটপাথ তো বেদখল) হাঁটছি আর যানজটে আটকে পড়া মানুষজন দেখছি। মাছি মারার কাজটা আমি এভাবেই করি। হঠাৎ এক লোক লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে আমার সামনে এসে বলল, আপনার নাম কি আনোয়ার?

আমি হ্যাঁ বলার সাথে-সাথে লোকটি আমাকে বুকে চেপে ধরে বলল, শালা– বুক মিলা।

লোকটির বুকে চাপা পড়ে আমার অনেক দিন আগের এক ঘটনা মনে পড়ে গেল।

সেদিন ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি। বইমেলায় বই প্রেমিকদের (নাকি মেলা-প্রেমিকদের?) প্রচণ্ড ভীড়। আমার ঠিক সামনেই এক নব দম্পতি (অবশ্যই নব-দম্পতি কারণ হাত ধরাধরির ব্যাপারটা আর যাই হোক এক মাসের বেশি দীর্ঘায়িত হতে পারে না)। হঠাৎ টের পেলাম তুলার মতো নরম একটা হাত আমার বাম হাতটা ধরল। তাকিয়ে দেখি সামনের সেই নব বধূটির হাত। স্বামীটি যে তার ডান পাশ ছেড়ে বাম পাশে চলে গেছে এটা সে খেয়াল করে নি। আমি সব বুঝেও না বোঝার ভান করলাম। করতেই হয়। অমন কোমল একটা হাতের ছোঁয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। তার পিছে-পিছে হাঁটতে লাগলাম। একটু পরে হাতে একটা মৃদু চাপও অনুভব করলাম। কিন্তু অপরিচিত একটা হাত কতক্ষণ আর ফাঁকি দিতে পারে? পাল্টা একটা চাপ দিলে হয়তো আরো কিছুক্ষণ থাকা যেত। ভুল হল সেখানেই। একটু পরে নব বধূটি ডান দিকে ঘাড় ঘুরাল। আমি টের পেয়ে ঝট করে আমার মুখটি ঘুরিয়ে নিলাম। বধূটি তারচে'ও ঝট করে আমার হাতটি ছুঁড়ে ফেলে দিল। যেন এতক্ষণ তার হাতে একটা বিছা লেগেছিল।

সেটা ছিল ভীড়ের ভুল। এটা কি ভালো করে না দেখার ভুল? বুক থেকে ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। এখনো তার মুখটি ভালো করে দেখতে পারি নি। যেভাবে চেপে আছে খুব শিগগির ছাড়বে বলেও মনে হয় না। আমার সাড়া না পেয়েই কিনা জানি না ছেড়ে দিল তাড়াতাড়িই। আমি তাকালাম। হ্যাঁ, 'চেনা চেনা লাগে তবু অচেনা।'

কিরে এখনো যে হা করে আছি। আমি জাহাঙ্গীর।

ও, তুই জাইঙ্গা।

আরে হ্যাঁ, জানোয়ারের জাইঙ্গা।

জাহাঙ্গীর আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু। দশ বছর আগের কথা– ঝট করে চিনে ফেলি কী করে? তা ছাড়া জাহাঙ্গীর বেশ মোটা হয়ে গেছে। তখন আমরা সবাই তাকে জাইঙ্গা ডাকতাম। আমাকে ডাকত জানোয়ার। তবে জানোয়ার ডাকটাই বেশি হত। জাইঙ্গা সব সময় ডাকা যেত না। আমাদের সাথে মেয়েরাও পড়ত। স্কুলে মেয়েরা বসত একপাশে। অন্যপাশে ছেলেরা। একটা মেয়ে ছিল সব সময় ছেলেদের উল্টো পাশের দেযাল ঘেঁষে বসত। নাম ছিল ছিদ্দীকা বেগম। এক নববর্ষে হল কি

মেয়েটা যেখানে বসত তার মাথা বরাবর দেয়ালে একটা লেখা দেখা গেল– ছিদ্দীকা বেগম ফুটপাথের নায়িকা। লেখা দেখে ফুটপাথের নায়িকা এক লাফে চলে গেল এফডিসিতে অর্থাৎ স্যারের কাছে। তাও আবার সেইসেই স্যার নয়, সামাদ স্যার। স্কুলে ছাত্রদের ত্রাস। এ ধরনের কেসের স্পেশালিস্ট। একটু পরেই স্যার তাঁর স্পেশাল বেতটি নিয়ে ক্লাশে ঢুকলেন। দরজায় পা দিয়েই বললেন, ছেলেরা সব বেঞ্চের নিচে মাথা দে আমরা কোনো কথা না বলে বেঞ্চের নিচে মাথা দিয়ে পরবর্তী আকর্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। স্যার ফার্স্ট টু লাস্ট স্পেশাল বেতের স্পেশাল অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। স্যার ভেবেছিলেন মারের ভয়ে আসল অপরাধীকে কেউ না কেউ ধরিয়ে দেবে। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ল না। সবার এক কথা– স্যার, জানি না। পরে জেনেছিলাম কাজটা জাহাঙ্গীর একাই করেছিল। আর সেদিন সে ক্লাশে ছিল না। জাহাঙ্গীর অবশ্য আমাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। সে আরেক গল্প।

জাহাঙ্গীর বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

যাচ্ছি না কোথাও।

তা হলে রিকশায় ওঠ। রিকশায় বসে গল্প করি।

রিকশায় উঠে বসলাম জাহাঙ্গীর জানাল সে ছয় মাস হল ঢাকা এসেছে। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছে। বেতন ভালোই দেয়। পাশ করেছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কথা বলতে-বলতে যানজট ছেড়ে রিকশা খোলা রাস্তায় এসে পড়ল। নিজে বেকার বলেই হয়তো চাকরির সুখের আলাপ আমার ভালো লাগছিল না। আমি ফিরে গেলাম পুরনো দিনে। বললাম, জাহাঙ্গীর, ছিদ্দীকা বেগমের কথা মনে আছে তোর। ওই যে ফুটপাথের নায়িকা।

মনে থাকবে না মানে। শোন, তোকে তা হলে অন্য এক নায়িকার কথা বলি। ইউনিভার্সিটির নায়িকা।

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, বল।

ফার্স্ট ইয়ার থেকেই লেগেছিলাম। সেকেণ্ড ইয়ারে এসে লেগে গেল। সবকিছুর বর্ণনা দিতে পারব না। দেওয়ার দরকারও নেই। শুধু চোখ দু'টির কথা বলি। ওই যে আছে না– 'তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ' সেই সর্বনাশা চোখ। শুধু আমার জন্যই সর্বনাশা নয়, সবার জন্য সর্বনাশা।

সেই সর্বনাশা চোখে ভাসতে-ভাসতে দিন যে কেমনে চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। চলে এল অনার্স ফাইনাল। সর্বনাশটা হল তখনই। এক বিকেলে সর্বনাশাটি হলের রুমে উপস্থিত। কী বাপার? জানাল, বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দুই দিন পরেই বিয়ে। চোখের পানি নাকের পানি এক করে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটাল। বললাম, এখন বাড়ি যাও। ভেবে-চিন্তে দেখি কী করা যায়।

বলল, ভাবাভাবির কিছু নেই তুমি আজই আমাকে বিয়ে করবে।

বুঝে দেখ অবস্থাটা। পরদিন আমার পরীক্ষা। বললাম, পাগল নাকি। আজরাঈল আসলেও বলব দয়া করে দু' দিন পরে আসুন ভাই।

এবার রেগে গেল। বলল, ফাজলামি করবে না। বিয়ে করবে কি না বল?

বললাম, এক শ' বার করব। এখন বাড়ি যাও। বিয়ে তো আর কালই হয়ে যাচ্ছে না।

বলল, ওসব আমি বুঝি না। তুমি যদি আজ বিয়ে না কর তা হলে এই দু' তলা থেকে আমি লাফিয়ে পড়ব।

মেয়েলি ভয় দেখানো আর কি।

বললাম, দাও লাফ। তবে এখান থেকে নয়, পাঁচ তলায় যাও। মরার অ্যাসুরেন্স পাওয়া যাবে।

আবার কান্না শুরু কর দিল। বলল, আমি সত্যিই লাফিয়ে পড়ব।

বললাম, পড় না, দাঁড়িয়ে আছ কন?

জাহাঙ্গীর এ পর্যন্ত বলে থামল। তারপর বলল, আমাকে অবাক করে দিয়ে সত্যিই সে লাফ দিল।

আমি আৎকে উঠলাম। বলিস কী! তারপর!

দৌড়ে নিচে নেমে গেলাম। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু গিয়ে দেখি হারামজাদী মরে নি। শুধু ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে।

চাপা মারছিস না তো?

এত বছর পর চাপা মারার জন্য তোকে রিকশায় ডেকে তুললাম। আমার সম্বন্ধে তোর এই ধারণা! যা নেমে যা!

আচ্ছা বল। তারপর?

আগে মাফ চা।

মাফ কর বন্ধু ভুল করে ফেলেছি। বল, তারপর কী হল?

লেংড়িকে নিয়ে কী করব সেটাই ভাবতে লাগলাম। চেয়ে দেখি লোকজনের অভাব নেই। এমন মজার ঘটনা কেউ কি রুমে থাকে। বন্ধুরা করল। রিকশা নিয়ে আসল। রিকশায় তুলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে পরে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

শেষ?

না। মজার ব্যাপারটা ঘটল পর দিন ভোরে। ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে তাকাতেই দেখলাম লাফিয়ে পড়ার জায়গাটায় কারা যেন ইট সাজিয়ে একটা স্মৃতিসৌধের মতো বানিয়েছে। সেখানে মোটা একটা কাগজ ঝুলিয়ে তাতে লিখে রেখেছে–

হে পথিক, দাঁড়াও একবার।
এখানেই ভেঙেছে পা আমার প্রিয়ার।

তারপর?

তারপর শেষ।

শেষ মানে? বিয়ে হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

তুই কিছু করলি না?

পাগল নাকি তুই। কথায়-কথায় সুইসাইড খাবে– ওটাকে বিয়ে করে ফাঁসিতে ঝুলব নাকি।

তুই আসলেই একটা জাইঙ্গা। মানুষ হলে এরকম করতে পারতি না।

তুই যা ভাবছিস তা ঠিক না। মেয়েরা ওসব মনে রাখে না। জামাই নিয়ে দিব্যি সুখে আছে। আমার সাথে দেখাও হয়েছে একবার। ঠিকানা দিয়েছে। বাসায় যেতে বলেছে। ভাবছি এক দিন যাব। চল না আজই যাই। এখান থেকে দূরে নয়।

আরে না, আমি কেন যাব?

চল না অসুবিধা নাই কোনো। এই রিকশা বামে।

রিকশা বামে গিয়ে একটা গলির ভিতর ঢুকল। আমি অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। দু' তলা একটা বাড়ির সামনে রিকশা থামল। জাহাঙ্গীর রিকশা থেকে নেমে বলল, আয়।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম আমরা। কলিবেল টিপতেই সুন্দরী এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন। আমার নজর গিয়ে পড়ল মহিলার চোখের উপর। জাহাঙ্গীরের কথা এক বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেলাম যখন বছর চারেকের টুকটুকে একটা মেয়ে এসে আব্বু, আব্বু বল জাহাঙ্গীরের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল।

ভদ্রমহিলা বললেন, উনি কে?

জাহাঙ্গীর বলল, ও হচ্ছে জানোয়ার হোসেন। যার কথা তোমাকে অনেক বলেছি। আর দেখ তো জানোয়ার এই ভদ্রমহিলার চোখ দু'টি চিনতে পারিস কি না।

ছিঃ তুমি এসব কী শুরু করলে?

সবে তো শুরু, আরো হবে। তাড়াতাড়ি তুমি চা আর বেশি করে টা-এর ব্যবস্থা কর।

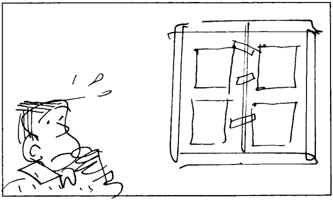

গেস্ট!
ইবনে ফয়েজ

আমি ছাপোষা মানুষ। একা থাকি। একটি ত্রিতল চিলেকোঠায় উঠিয়াছিলাম বছর দুয়েক আগে। ভাড়ার আগাম মোটামুটি হাতের মুঠোয় থাকিলেও মাঝে-মধ্যে বাড়িওয়ালার দাপটে ফসকাইয়া যাইতে চায়। কিন্তু তথাপি আমি দুই হাতে লাগাম জোড়সে আকড়াইয়া আছি। প্রায় প্রতি মাসেই বাড়িওয়ালার দাঁত খিচুনির জবাবে গত দুই বছর যাবৎ পিছল হাসি দিয়া কোনোমতে টিকিয়া আছি। যাকে বলে নাকের ডগায় দম ধরিয়ে রাখা আর কি?

ঘরে আমার একখানি মাত্র জানালা, তাও আবার পেরেক দিয়া আটকানো। তাহাও বাড়িওয়ালার নির্দেশেই। কেননা জানলার ওই পাশের ফ্ল্যাটে একজন রিটায়ার্ড আমলা সস্ত্রীক বাস করেন। তাহার পিঠাপিঠি দুই কন্যা। বলা বাহুল্য কাঁচা বয়স।

প্রথম যখন আসিয়াছিলাম তখন জানালা খোলাই থাকিত। অবশ্য ঐ ফ্ল্যাটে তখনও আমলা ভদ্রলোক উঠিয়া আসেন নাই। অতঃপর একদিন উঠিয়া আসিলেন দুই কন্যা ও স্ত্রীসহ।

আমিও মোটামুটি জানালার পর্দা সরাইয়া দুই আঙুলে কায়দা করিয়া একখানি সিগারেট ধরাইতে যাইতেছি... ওপাশের ব্যালকনিতেও চকিত চাহনি... ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি মুহূর্তে বাড়িওয়ালা গোটা কতক দেড় ইঞ্চি পেরেক ও হাতুড়ি সমেত উপস্থিত। আমাকে একরকম ঠেলিয়া

সরাইয়া জানালায় পেরেক মারা শুরু করিলেন। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু তাহার ঘূর্ণিত চক্ষু দেখিয়া দমিয়া গেলাম। কে জানে যদি নোটিশ দিয়া বসেন।

পরে জানিতে পারি যে ওই পাশের ফ্ল্যাটের আমরার কন্যার সহিত বাড়িওয়ালার পুত্রের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। তাই এই সাবধানতা।

তো এইভাবেই বন্ধ জানালার পাশে একখানি ছারপোকা সমৃদ্ধ তক্তপোশে জীবন কাটাইতেছিলাম। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। আমার একরুমের চিলেকোঠায় গেস্ট! সম্পর্কে চাচাত ভাই। গ্রাম হইতে আসিয়া উপস্থিত, বয়সে আমার কিছু বড়। মুখে অমায়িক হাসি, হাতে ব্যাগ, কাধে স্যুটকেস। প্রথমে তাহাই ভাবিয়াছিলাম অর্থাৎ তাহার কাধের কাছে ছোটখাট একটা স্যুটকেস ধরা বুঝি। পরে বুঝিলাম উহা স্যুটকেস নহে, জামা-জুতা পরানো এক ট্রানজিস্টার। উচ্চ গ্রামে সৈনিক ভাইদের জন্য অনুষ্ঠান 'দুর্বার' চলিতেছে।

আমি বোধহয় পড়িয়াই যাইতেছিলাম। সে আসিয়া জাপটাইয়া ধরিল। পরে বুঝিলাম উহা হৃদ্যতারই প্রকাশ।

: কেমন আছ? বহু দিন ঢাকা বেড়ানো হয় না তাই আসা।

বলিয়া সে আশ্চর্য দ্রুততায় তাহার ব্যাগ, স্যুটকেস থুড়ি ট্রানজিস্টার যথাস্থানে রাখিয়া লুঙ্গি পরিয়া নিমের ডাল চিবাইতে-চিবাইত 'পায়খানা' অন্বেষণ করিতে লাগিল। আমি 'পায়খানা' দেখাইয়া নিচে নামিলাম।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয় স্ট্রোকের ধাক্কায় বিষম খাইলাম। আমার ক্রুশবিদ্ধ জানালার পাট হাট করিয়া খোলা। কানে সৈনিক ভাইদের 'দুর্বার' চাপিয়া নায়ক রাজ রাজ্জাকের ভঙ্গিতে হাফিজ ভাই দণ্ডায়মান। আর ওই পাশের ফ্ল্যাটের ভাবি বধু অথবা শ্যালিকা অবাক হইয়া যেন এদিক পানেই তাকাইয়া আছে।

: জা-নালা কে খুলল?

: আমি। এটা দিয়া দুই বাড়ি দিতেই খুলে গেল।

বলিয়া আমাকে টেবিলের উপরে রাখা শখের কৃস্টালের ছাইদানিটা দেখাইল। আর ঠিক এমনি সময় সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ। গোটা কতক পেরেক ও হাতুড়ি হাতে রক্ত-চক্ষু বাড়িওয়ালা।

বাড়িওয়ালার সহিত সমস্ত ব্যাপারটি লইয়া সমঝোতা হইতে বিস্তর বেগ পাইতে হইল। চাচাত ভাই যে মাত্র দিন দুয়েক থাকিবে এবং

জানালাও আমরা খুলি নাই, আচমকা বেপরোয়া বাতাসে... তার উপর পেরেকে জং ধরা, পুরনো কাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়িওয়ালা বুঝিলেন। তবে খুব কষ্টে বুঝিলেন বলিতে হইবে। তবে আমি বুঝিলাম যে আমার চাচাত ভাই-এর মায়া কাটাইতে হইবে যত দ্রুত সম্ভব। তাহাকে বিদায় করার নানান পরিকল্পনা মাথায় আসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত একটি ফন্দি মনপূত হইল।

চাচাত ভাই হাফিজ গত তিন দিন ধরিয়া আমার সাথে আছেন। তাহার দৈনিক রুটিন এইরূপ– সকাল ৯টার মধ্যে নাস্তা সারিয়া কানে সৈনিক ভাইদের 'দুর্বার'সহ গৃহত্যাগ এবং সন্ধ্যা ৮টায় গৃহে প্রবেশ, খাওয়াদাওয়া ও তৎক্ষণাৎ শোয়া এবং শোয়া মাত্র লাগাতার নাসিকা ধ্বনি। এমতাবস্থায় আমি ঠিক করিলাম একরাতে আমি গা ঢাকা দিব যেন ব্যাটা ঘরে ঢুকিতে না পারে। ঘরে ঢুকিতে না পারিয়া ত্যাক্তবিরক্ত হইয়া হোটেলে উঠিবে বা বিদায় হইবে। কিন্তু রাতে গা ঢাকাই বা দেই কোথায়? বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বড়জোর ন'টা পর্যন্ত কিন্তু তারপর? হঠাৎ মনে পড়িল, পাইয়াছি, সেকেণ্ড শো বাংলা সিনেমা দেখিলেই হয়।

সেদিন কাজে যাওয়ার শুরুতেই পাড়ার হলের একখানি সেকেণ্ড শোর টিকিট কাটিলাম। অবশ্য ঘরের দরজায় একখানি নোট সাঁটিয়া আসিতে ভুলিলাম না। তাতে 'কখন ফিরি ঠিক নাই। জরুরি কাজে আটকাইয়া গিয়াছি।' নিচে আমার স্বাক্ষর। সেকেণ্ড শো বলিয়াই বোধ করি দর্শককূল কম। আমার দুই পাশের সীটই খালি। অনেক দিন পর ছবিতে জমিয়া গেলাম। নায়িকা নাকের সহিত এক বস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়াছে। রাতে থাকিবার জায়গা নাই... অবশেষে এক পার্কের সবুজ চত্বরে নায়িকার কোলে মাথা দিয়া নায়ক চক্ষু বুজিয়াছে মাত্র। দূরে পূর্ণিমা-চাঁদ। হঠাৎ দলবলসহ ভিলেন উপস্থিত... আর এমনি সময় আমার ঘাড়ের উপর গরম নিঃশ্বাস পড়িল।

: ফয়েজ না? এই তোমার জরুরি কাজ?

বাকি ছবিটুকু হাফিজ ভাই আমার পাশে বসিয়াই দেখিলেন। বলাই বাহুল্য দরজায় আমার জরুরি কাজের নোটিশ দেখিয়া তিনিও সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট কাটিয়াছিলেন!

হঠাৎ বৃষ্টি

মাসুদ কামাল হিন্দোল

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনী প্রচারণায় বেরিয়েছেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা। আমাদের প্রিয় দু'নেত্রী ম্যাডাম আর আপা। এ বৈরী পরিবেশে কাকতালীয়ভাবে জিরো পয়েন্টের সামনে দু'নেত্রীর দেখা হয়ে গেল। এখানে এসে দু'জনেই থমকে দাঁড়ালেন। তাদের সামনে এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তাঁরা নস্টালজিয়ায় ভুগতে থাকলেন। মনে পড়ে গেল সোনালী অতীত। তাঁরা দু'জনে এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করেছেন আশির দশকের শেষ দিকে। দিনগুলো ছিল কত মধুর আগামীর স্বপ্নময়। সে দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। সে সময়গুলো স্মৃতির অ্যালবামে লিপিবদ্ধ থাকবে। পত্রিকার পাতা আর টিভি আর্কাইভে। সে সময় তারা দেশ ও জাতিকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। স্বপ্নের গণতন্ত্র এনে দিতে চেয়েছিলেন। তাদের মনে পড়ে গেল নূর হোসেনের কথা। দেশের জন্য জীবন দিয়েছিল হাসিমুখে নূর হোসেন। বুকে-পিঠে লিখেছিল 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক'। আজ দু'জনের ব্যর্থতায় নূর হোসেনরা প্রতিদিন জীবন দিচ্ছে।

আগে দেখা হলে দু'নেত্রীর সালাম বিনিময় হত। মাঝে মাঝে দূতের মাধ্যমে চিঠি বা ফুল দেয়া নেয়া হত। এতদিন এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ইদানিং একজন আরেকজনের মুখ দেখতে চাচ্ছেন না। দু'জনের পথ গেছে

দু'দিকে বেঁকে একজন ডানে গেলে আরেকজন যান বঁয়ে। আজ ঘটে গেল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা (রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই)। দুজনের দেখা হল। অ-নে-ক কথাও হল। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সবসময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে, কখন কোন দিন কোন সময় তাঁরা দু'জনে কথা বলবেন। একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে। এ ঐতিহাসিক ঘটনার একমাত্র নীরব সাক্ষী ছিলাম আমি।

: হ্যালো, ম্যাডাম কেমন আছেন?

: ভাল। আপনি কেমন আছেন?

: ভাল। খুব ভাল; ভালর চাইতেও ভাল।

: ভাল থাকলেই ভাল। আপা আপনার কানের অবস্থা এখন কিরকম। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?

: হ্যাঁ পাচ্ছি। ম্যাডাম আপনার পায়ের ব্যথার খবর কী? ঠিকমত হাঁটতে পারছেন তো!

: আগের চেয়ে বেশ ভাল।

: ম্যাডাম আপনার ছেলে-বউমারা-নাতনীরা কেমন আছে?

: আল্লার রহমতে আপনাদের দোয়ায় বেশ ভাল আছে। আপনার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা কেমন আছে?

: দেশ-বিদেশ মিলিয়ে ভালই আছে।

: শুনে খুশী হলাম। এখন খুব কম মানুষই বলতে পারে সে বা তার পরিবার ভাল আছে।

: ম্যাডাম আপনার বড় ছেলে তো সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করল। প্রথমেই বড় পদ দিয়ে দিলেন? আপনাদের দলে নাকি ১নং যুগ্ম মহাসচিবের কোন পদ নেই?

: দলীয় নেতা-কর্মীদের লাগাতার চাপে বাধ্য হয়েছি তাকে রাজনীতিতে নামাতে। আর বড় পদের কথা বলছেন সে তো আমাদের যোগ্য উত্তরসূরী। আগামী দিনের ভবিষ্যত কাণ্ডারী।

: ম্যাডাম আপনি কি তাহলে বড় ছেলের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন?

: অবসরের ঘোষণাতো আপা আপনিই দিয়েছিলেন। অবসরতো আপনার নেবার কথা। ৫৭ বছরতো পার হয়ে গেল!

: আরে ওটা ছিল কথার কথা। আমিতো কত কথাই বলি।

: শুনলাম আপনার ছেলেও নাকি রাজনীতিতে আসছে?

: বাঙ্গালী জাতি দেশ জনগণ চাইলে অবশ্যই রাজনীতিতে আসবে। আমি তো বিশেষ পরিস্থিতিতে ২৫ বছর আগে এত বড় একটা দলের সভানেত্রী হয়েছিলাম। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ও কেন আসবে না!

: আপা আপনার বিদেশিনী পুত্রবধূ কেমন আছে?

: ভাল আছে। দেখেননা আমাদের বন্ধুদেশ ভারতে সোনিয়া কি খেল দেখালেন বিদেশী বধূ হয়েও সোনিয়া একজন আপাদমস্তক আদর্শ ভারতীয় গৃহবধূ। আমার পুত্রবধূও আদর্শ বাঙ্গালী গৃহবধূ।

: আদর্শ গৃহবধূ হলেই ভাল।

: জানেন ম্যাডাম আমি না একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দিচ্ছি আবেগ আপ্লুত হয়ে। চোখ খুলে দেখি সামনে ফাঁকা। যতদূর পর্যন্ত চোখ যায় একটা কাক-পক্ষীও চোখে পড়ছে না।

: আপা আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি বিশাল গাড়ীর বহর নিয়ে লংমার্চে বের হয়েছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি কোথাও কেউ নেই। জনশূন্য রাজপথ।

: আমাদের দু'জনের স্বপ্নের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। চলুন ম্যাডাম আমরা একমঞ্চ থেকে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেই নির্বাচনী ফলাফল যা হবে তা মেনে নেব। সূক্ষ্ম, স্থুল কিংবা পুকুর চুরির কথা বলবো না। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবো না। সহনশীল হব। জাতীয় সমস্যা মোকাবিলায় ঐকমত্যে পৌঁছবো।

: আপা আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। চলুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেব। ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের মত সিংহাসন আঁকড়ে ধরে থাকবো না।

দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। জয় বাংলা।

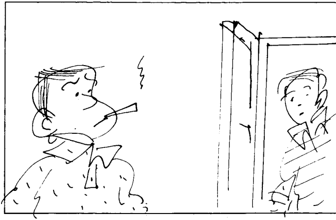

ফজল আলীর ১৪০০ সাল

আহসান হাবীব

অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক ফজল আলী চিন্তিত মুখে ঝুঁকি নিয়ে একটা বেনসন ধরিয়ে ফেলে। সেই সাত সকালে এক প্যাকেট বেনসন কিনে রাখা হয়েছে সভাপতির জন্যে। সভাপতি মানে অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের আজীন সভাপতি, তিন তিনটি গার্মেন্টসের মালিক সৈয়দ মাজহারুল আলম। সভাপতির আসার কথা সকাল নয়টায়, এখন বাজে পৌনে বারটা, ব্যাটার পাত্তা নেই। তার ডোনেশনের উপর নির্ভর করছে ১৪০০ সাল উপলক্ষে নাটক মঞ্চস্থ হবে, না দায়সারা গোছের অনুষ্ঠান করে এবারেও অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের কর্মকাণ্ড চালিয়ে নেওয়া হবে। এবার 'চেতনার অগ্নি' মঞ্চস্থ না হলে আর এই জীবনে এই নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে মনে হয় না।

'চেতনার অগ্নি' ফজল আলীর লেখা চতুর্থ মঞ্চ নাটক। আগের তিনটির কোনোটি এখন পর্যন্ত মঞ্চস্থ না হলেও দ্বিতীয়টি এক প্রকাশক ছাপার আশ্বাস দিয়েছে, সেও বছর দুয়েক আগের কথা। অবশ্য ফজলের সঙ্গে প্রকাশকের সরাসরি আলাপ না হলেও প্রকাশকের এক ভাগিনা ফজলের মঞ্চ নাটকটি পড়ে বলেছিল, এ নাটক বাংলা সাহিত্যে একটি 'মাইলস্টোন' হয়ে থাকবে। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটি আপাতত 'স্টোনচাপা' পড়ে আছে।

ঠিক তখনই দরজায় টোকা পড়ে। শশব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে ফজল। না, সভাপতি নয়। অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী রফিক।

: ফজল ভাই, সর্বনাশ হয়েছে!

: কী?

: নাজমা অভিনয় করবে না। সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

এরকম অবস্থায় নাটকের পরিচালকের মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার কথা কিন্তু ফজল বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ল। স্ট্রোক হলে কেমন লাগে ফজলের অভিজ্ঞতা নেই, তবে তার মনে হল সেই রকম একটি ব্যাপারই বোধ হয় ঘটল এই মুহূর্তে।

'চেতনার অগ্নি' নাটকের মূল থিম নায়িকাকেন্দ্রিক। মোট সাড়ে তিন শ' ক্রস ডায়ালগে অশ্রু ঝরানো সংলাপ আছে কম করে হলেও বত্রিশটি। গত দেড় মাস ধরে নাজমাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রিহার্সেল দিয়ে...আর আজ এই মুহূর্তে...ওফ ফজলের বুকের ব্যথাটা যেন হঠাৎ পেটের দিকে ধাবিত হল। লিভার স্ট্রোক বলেও কি কিছু আছে? কে জানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে তো আজকাল নতুন-নতুন সব আবিষ্কার হচ্ছে।

: ফজল ভাই নায়িকাকে পুরুষ ভিলেন করে পুরো নাটকটা আবার ঢেলে লিখুন।

করুণার দৃষ্টিতে ফজল রফিকের দিকে তাকায়। আরে নাট্য-সাহিত্য কি ঢালাঢালির ব্যাপার যে...

সন্ধ্যা নাগাদ দ্বিতীয় দুঃসংবাদটি আসে। অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের আজীবন সভাপতি, পাড়ার মাথা, সমাজ সেবক, কোটিপতি, তিন তিনটি গার্মেন্টসের মালিক সৈয়দ মাজহারুল আলম এক বস্ত্রে গৃহ ত্যাগ করেছেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে চট্টগ্রাম গেছেন, খুব শীঘ্রই ফিরবেন তেমন আশা নেই।

ফজল দ্বিতীয় বেনসনটি ধরাতে দেরি করে না। অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের টাকায় কেনা বেনসনের প্যাকেট। উপায় কি দোকানদার তো আর ফেরত নিবে না। প্যাকেট খোলা হয়ে গেছে। নকল বেনসন না কি? এত বিস্বাদ কেন?

: ফজল ভাই নাটক বাদ দেন, নাজমা বিট্রে করল আর ওদিকে সভাপতিও...এর থেকে চলেন একটু খাইদাই।

দু-তিন জন তাকে সায় দেয়, কিন্তু ফজল নিশ্চুপ।

: নাজমা ছাড়াই নাটক হবে...

ফজলের রক্ত চক্ষুর ঘূর্ণনের দিকে তাকিয়ে অন্যান্যরা কথা খুঁজে পায় না।

: নাটকের থিম আমি বদলে ফেলেছি। যথেষ্ট গাম্ভীর্য নিয়ে পরিচালক ফজল আলী মুখ খুলে। নাজমা থাকবে না তবে তার জায়গায় একটা লাশ পড়ে থাকবে। নাজমার সমস্ত সংলাপ আসবে ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে।

: লাশটা কে হবে?

: লাশ হব আমিই। এটা হবে একটা আধিভৌতিক নিরীক্ষাধর্মী প্রতীকী নাটক।

: কিন্তু... সভাপতি নেই...খরচাপাতি, ফাণ্ডের যে অবস্থা।

সাধারণ সম্পাদক ফজলকে খুব চিন্তিত মনে হয় না। ঝিম মেরে বসে অনামিকার হাড়ে চেপে বসা হীরে বসানো সোনার আংটি ঘোরানোর চেষ্টা করে। 'পুরুষ মানুষের হাতে হীরের আংটি কোনো মানে হয়!'

যথারীতি সন্ধ্যায় স্কুলের মাঠে নাটক জমে উঠে। 'চেতনার অগ্নি'। আধিভৌতিক নিরীক্ষাধর্মী প্রতীকী নাটক। রচনা ও নির্দেশনা নিবেদিত প্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী অঙ্কুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ফজল আলী।

শেষ সীনে মঞ্চের পর্দা সরতেই দেখা গেল মঞ্চজুড়ে নায়িকা 'সুরঞ্জনার' লাশ (পা দুটো একটু নড়ে উল যেন!)। ব্যাকগ্রাউণ্ডে নাজমার কম্পিত আবেগ বিহ্বল সংলাপ (ভাগ্য ভালো যে রিহার্সেলের সময় টেপ করা লি)।

সংলাপ শেষ হয়েছে। এবার নায়িকার লাশ উঠে দাঁড়ানোর কথা। এখানেই জমে উঠবে নাটকের চরম 'ক্লাইমেক্স'। দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে হৃদয়ঙ্গম করবে এই প্রতীকী নাটকের মর্মবাণী! কিন্তু ব্যাপার কী? সহকারী পরিচালকের ঘড়িতে আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে অনেক্ষণ। লাশ তো উঠছে না। দর্শকদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। দর্শক সারি থেকে নাজমা নামের একট মেয়ে ছুটে যায় মঞ্চের দিকে, ততক্ষণে সহকারী পরিচালকের নির্দেশে পর্দা ফেলে দেওয়া হয়েছে!

ঘুম ভাঙতেই লজ্জিত ফজল আলী আবিষ্কার করে তার সামনে উদ্বিগ্ন

অনেকের মধ্যে নাজমাও ব্যাকুল ভঙ্গিতে ঝুঁকে আছে! তার অনামিকায় ঝকঝক করছে একটা হীরের আংটি। সারা দিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়া 'লাশ' তখনও বুঝে উঠতে পারে নি ১৪০০ সালের আগেই কোন ফাঁকে যেন তার বাবা-মা নাজমার হাতে এন্‌গেজমেন্ট রিং পরিয়ে এসেছেন। বিয়ে-শাদীর জন্যে ১৪০০ সাল নাকি আবার অশুভ!

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET